বাঁশের চারা উৎপাদন ও বাঁশ চাষ পদ্ধতির ম্যানুয়েল

ARANNAYK FOUNDATION
Conserving forests for the future

Food and Agriculture Organization of the United Nations

IOM · OIM

প্রকাশক ও কপিরাইট
আরণ্যক ফাউন্ডেশন
ওয়াসি টাওয়ার (৭ম তলা)
৫৭২/কে, মাটিকাটা রোড (ইসিবি চত্তর)
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।
Web:www.arannayk.org

" Strengthening the Supply Chain of Planting Materials and Community- Based Reforestation for Landslide Prevention Project - Ukhiya and Teknaf Upazila"

Implemented by
FAO and Arannayk Foundation, Bangladesh

লেখক
মোঃ হারুন-উর-রশীদ
ফরিদ উদ্দিন আহমেদ

প্রকাশকাল
মার্চ ২০১৯

প্রচ্ছদ ছবি
বুদুম বাঁশের ঝাড়
ফরিদ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মরিয়ম মুক্তি

মুদ্রণে
মুক্তি প্রিন্টার্স
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
মোবাঃ০১৭১২১৪৫৯১৯

ISBN = 978-984-34-6952-6

বাঁশের চারা উৎপাদন ও বাঁশ চাষ পদ্ধতির ম্যানুয়েল

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	২
বাঁশের পরিচিতি	৩
বাঁশের গুরুত্ব ও ব্যবহার	৩
বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের বাঁশ	
কক্সবাজারে এলাকায় বিদ্যমান বাঁশের প্রজাতি	৪
বোরাক বাঁশ	৪
মিতিঙ্গা বাঁশ	৮
ফারুয়া বা বার্মা বাঁশ	১০
তল্লা বাঁশ	১২
বাইজ্যা বা বারিয়ালা বাঁশ	১৪
বুদুম বা ভুদুম বাঁশ	১৭
ওরা বা তরু বাঁশ	২০
কালি বা কালিছড়ি বাঁশ	২৩
মুলি বা পাইয়া বাঁশ	২৫
লতা বাঁশ	২৯
বাঁশের চারা ও কলম উৎপাদন পদ্ধতি	৩২
বীজ থেকে চারা উৎপাদন	৩২
অঙ্গজ পদ্ধতিতে কঞ্চি কলম উৎপাদন	৩৬
পলিব্যাগ চারার সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ	৪০
বসত বাড়িতে এবং পতিত জমিতে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাঁশ চাষ	৪২
মুথা, কঞ্চি কলম বা চারা লাগানোর নিয়মাবলী	৪৩
রোপিত মুথা, কঞ্চি কলম বা চারার পরিচর্যা	৪৪
বাঁশ ঝাড়ের পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা	৪৫
বাঁশের রোগ-বালাই ও দমন ব্যবস্থা	৪৬
বাঁশ ঝাড় থেকে পরিপক্ক বাঁশ আহরণ ও ঝাড় পাতলাকরণ	

মুখবন্ধ

বাঁশ বনজ ও গ্রামীণ কৃষি ফসল হিসেবে বাংলাদেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য সুরক্ষা, ভুমিক্ষয় রোধ, পতিত জমির সুব্যবহার, মাটির গুণগত মান পরিবর্তন, বন্য প্রাণীর খাদ্য ও আশ্রয়স্থল, নির্মাণ কাজে, শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে বাঁশের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাঠের বিকল্প হিসেবে বাঁশ বিবেচিত। গাছপালা থেকে আহরিত কাঠ প্রাপ্তির চেয়ে বাঁশ অল্প সময়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে সক্ষম। সম্প্রতিকালে কক্সবাজার এলাকায় মিয়ানমার থেকে অনুপ্রবেশকারী প্রায় ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিবেশ বিপর্যয়ে এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিপুল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আবাসন চাহিদা পূরণে বাঁশের বিকল্প নেই। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বাঁশের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বাঁশ দিয়ে রোহিঙ্গাদের আবাসন সংকট উত্তোরণে প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থার আর্থিক সহায়তায় কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী অধ্যুষিত এলাকার আশপাশের গ্রামগুলোতে অধিক হারে বাঁশ উৎপাদনের নিমিত্তে বাঁশ চাষের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচি অনুসারে আরণ্যক ফাউন্ডেশন কর্তৃক গ্রামগুলোর বসতভিটা ও পতিত জমিতে ব্যাপক হারে বাঁশ চাষের জন্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি বাঁশের চারা সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া আগামীতে বাঁশ চাষের জন্য কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত নার্সারিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চারা বা কঞ্চি কলম উৎপাদনের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য কৃষি ফসল বা গাছপালার মতো বাঁশে প্রতি বছর ফুল-ফল আসে না এবং পর্যাপ্ত বীজ পাওয়া যায় না। বাঁশের বিভিন্ন প্রজাতিতে দীর্ঘ সময়ে অর্থাৎ ৩০ থেকে ৮০ বা ১০০ বছর বিরতিতে ফুল-ফল আসে এবং একাধারে ২-৩ বছর ফুল-ফল দিয়ে ঝাড়ের সকল বাঁশ মারা যায়। আবার বাঁশের কিছু প্রজাতিতে ফুল এলেও বীজ হয় না। বাঁশের চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্তরায়। বিকল্প পন্থায় গবেষকদের উদ্ভাবিত "কঞ্চি কলম" নামক অংগজ পদ্ধতিতে বাঁশ চাষের জন্য অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদন করা যায়। এ পদ্ধতিতে বাঁশের কিছু প্রজাতিতে চারা উৎপাদন করা সম্ভব। তাই নার্সারি ব্যবসায়ে জড়িত লোকজনকে সম্যক জ্ঞান প্রদানের নিমিত্তে **"বাঁশের চারা উৎপাদন ও বাঁশ চাষ পদ্ধতির ম্যানুয়েল"** শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকাশনায় যে ছবি ব্যবহার করা হয়েছে তার বেশির ভাগ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর প্রকাশনা থেকে নেয়া হয়েছে। আমরা বন গবেষণা ইনষ্টিটিউটের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বন গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এম খায়রুল আলম ম্যানুয়েলটি সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন। তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং নার্সারি মালিকগণ এ পুস্তিকা দ্বারা উপকৃত হবেন এবং দেশে বাঁশ সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হবেন।

বাঁশের চারা উৎপাদন ও বাঁশ চাষ পদ্ধতির ম্যানুয়েল

বাঁশের পরিচিতি ঃ

বাঁশ বাংলাদেশের একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ এবং গরীবের কাঠ বলে পরিচিতি। বাঁশ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল একটি উদ্ভিদ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে কমবেশি বাঁশ জন্মায়। সাধারণত বাঁশ ১০ ফুট থেকে ১০০ ফুট উচ্চতা এবং ১ থেকে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত মোটা হয়ে থাকে।

বাঁশের গুরুত্ব ও ব্যবহার ঃ

বাঁশের বহুবিধ ব্যবহারের ফলে আমাদের দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিকট বাঁশের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীনকাল থেকে দৈনন্দিন জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাঁশ থেকে তৈরি হয়ে আসছে। বাঁশকে গরিবের কাঠ বলা হয়ে থাকে। কারণ আমাদের দেশে গ্রামের গরিব মানুষেরা বাঁশ দিয়ে কম খরচে ঘর বাড়ি এবং গৃহের অবকাঠামো নির্মাণ করে থাকে। বাঁশ দিয়ে গ্রামে-গঞ্জে আসবাবপত্র থেকে শুরু করে গৃহ-সামগ্রী তৈরি করে থাকে। বাদ্যযন্ত্র তৈরি, হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের কাঁচামাল হিসেবেও বাঁশ সমাদৃত। বিদেশে বাঁশ দিয়ে ফার্নিচার ও ফ্লোর টাইলস্ বানিয়ে তা ব্যবহার করা হচ্ছে। কাগজ তৈরিতেও বাঁশ ব্যবহার করা হয়। বাঁশের ডগা এবং বাঁশের কচি কোঁড়ল মুখরোচক ও সুস্বাদু সবজি হিসেবে খাওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা বাঁশের ভেতরে পিঠা ও খাবার তৈরি করে থাকে। বাঁশ ঝাড় ঝড়ো হাওয়া প্রতিরোধসহ পাহাড়ি এলাকার ভূমি ধ্বস, নদী-নালা ও খাল পাড়ের ভূমি ক্ষয় রোধ করে।

প্রতিবেশ ব্যবস্থায় বাঁশের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাঁশের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে অসংখ্য প্রাণী। বাঁশ ঝাড়ে বিচরণ করে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। এ পাখিগুলো বাঁশ ঝাড়ের কীটপতঙ্গ খেয়ে জীবন ধারণ করে। বিভিন্নপ্রজাতির বক বাঁশ ঝাড়ে কলোনী করে প্রজনন করে। এছাড়া বাঁশ ঝাড় বিভিন্ন প্রজাতির সরীসৃপ ও উভচর প্রাণীর আবাসস্থল। বাঁশ দ্রুত বর্ধনশীল উদ্ভিদ, কাজেই এ গাছ বাতাস থেকে অনেক বেশি কার্বন শোষণ করে নিতে পারে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের বাঁশ ঃ

বাংলাদেশে ৩০ প্রজাতির বাঁশ পাওয়া যায়। বন-জঙ্গলে মুলি, মিতিঙ্গা, ডলু ও নলি প্রজাতির বাঁশ পাওয়া যায়। এসব বাঁশের অভ্যন্তরভাগের ফাঁপা অংশ মোটা এবং দেয়াল বা প্রাচীর পাতলা হয়ে থাকে। অপরদিকে গ্রামগঞ্জের বোরাক, বাইজ্যা, বড়ুয়া, বেতুয়া, তল্লা, মাকলা, মরাল ইত্যাদি বাঁশ জন্মে। এসব বাঁশের অভ্যন্তরের ফাঁপা অংশ খুব কম থাকে। অর্থাৎ দেয়াল বা প্রাচীর মোটা হয়ে থাকে।

কক্সবাজার এলাকায় বিদ্যমান বাঁশের প্রজাতি ঃ

কক্সবাজারের বন-জঙ্গলে এবং গ্রামগঞ্জের বসত বাড়িতে যে সকল জাতের বাঁশ পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে-

ক্র:নং	বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	বাঁশের উৎস ও ধরন
১	বোরাক বাঁশ	*Bambusa balcooa*	গ্রামীণ এবং মোটা বাঁশ
২	মিতিঙ্গা বাঁশ	*Bambusa burmanica*	গ্রামীণ ও বনজ এবং মোটা বাঁশ
৩	ফারুয়া বাঁশ	*Bambusa polymorpha*	গ্রামীণ ও বনজ এবং মোটা বাঁশ
৪	তল্লা বাঁশ	*Bambusa tulda*	গ্রামীণ ও বনজ এবং পাতলা বাঁশ
৫	বাইজ্যা বাঁশ	*Bambusa vulgaris*	গ্রামীণ এবং মোটা বাঁশ
৬	বুদুম বাঁশ	*Dendrocalamus giganteus*	গ্রামীণ এবং মোটা বাঁশ
৭	ওরা বাঁশ	*Dendrocalamus longispathus*	বনজ এবং মোটা বাঁশ
৮	কালি বাঁশ	*Gigantochloa andamanica*	বনজ এবং মোটা বাঁশ
৯	মুলি বাঁশ	*Melocanna baccifera*	বনজ এবং পাতলা বাঁশ
১০	লতা বাঁশ	*Melocalamus compactiflorus*	বনজ এবং মোটা বাঁশ

বোরাক বাঁশ

পরিচিতি ঃ বোরাক বাঁশ (*Bambusa balcooa*) অঞ্চলভেদে বরাক (ময়মনসিংহ, কুমিল্লা), ভালকো বাঁশ (যশোর), শিল বরুয়া, হিল বরুয়া, জিল বরুয়া, তেলি বরুয়া (সিলেট), বালুক, বালকু, বালকুয়া (রাজশাহী), বইরা, গিটাবোরা (চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল), কাঁটা বাইজ্যা (চট্টগ্রাম), বোরা বাঁশ (দিনাজপুর), বড়ুয়া, ভাইল্লো বাঁশ ইত্যাদি নামে পরিচিত। এটি একটি শক্ত ধরনের গ্রামীণ বাঁশ এবং বসত বাড়িতে চাষ করা হয়। নির্মাণ কাজে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে এবং বাঁশের কোঁড়ল খাওয়া যায়।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান ঃ বোরাক বাঁশের চাষ সারা দেশে হয়ে থাকে। তবে দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, সিলেট, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলাসমূহের গ্রামীণ এলাকায় লাগানো বোরাক বাঁশের বিস্তৃতি বেশি।

ছবি-১ (ক): বোরাক বাঁশের ঝাড়

ছবি-১ (খ): বোরাক বাঁশের গোড়ার অংশের গিঁটে বায়বীয় মূল (বামে), গিঁটের উপরিভাগে রোমশযুক্ত সাদাটে বন্ধনী (মাঝে) এবং অভ্যন্তরভাগের ফাঁপা অংশ কম (ডানে)

পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য ঃ বোরাক একটি শক্ত ধরনের ও পুরু প্রাচীরযুক্ত বাঁশ। এটি লম্বায় ৩৫-৬৫ ফুট ও মোটায় ২.৫-৬.০ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। ঝাড়ের বাঁশগুলো ঘনভাবে বিন্যস্ত, বাঁশের গোড়ার অংশের গিঁটগুলোতে বায়বীয় মূল এবং গিঁটের উপরিভাগে রোমশযুক্ত সাদাটে বন্ধনী বা বলয় থাকে। দুই গিঁটের মধ্যবর্তী স্থান লম্বায় ৮-১৬ ইঞ্চি এবং অভ্যন্তরভাগের ফাঁপা অংশ কম। গোড়ার দিকের গিঁটগুলোতে জন্মানো কঞ্চিগুলো প্রায়ই পাতা বিহীন এবং মধ্যভাগ থেকে উপর পর্যন্ত গিঁটগুলোতে সচরাচর একত্রে ৩টি শক্ত কঞ্চি বের হয় যার মধ্যে মাঝের কঞ্চিটি আকারে বড়। পাতা বল্লমাকার খসখসে ধরনের। বাঁশ ঝাড়ের বাহিরের দিকে জন্মানো নতুন কোঁড়ল কালচে সবুজ বর্ণের। কোঁড়লের সীথগুলোর উপরিপৃষ্ঠ রোমাবৃত, নিম্নপৃষ্ঠ রোমশহীন মসৃণ এবং সীথগুলো খসে পড়ে। বোরাক বাঁশে ফুল-ফল আসার আবর্তকাল ৩৫-৪৫ বছর এবং বীজের প্রাপ্তি বিরল বা শূন্য।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার ঃ প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে প্রাকৃতিকভাবে বাঁশ ঝাড়ের বাহিরের দিকে নতুন কোঁড়ল জন্মায় এবং বাঁশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নতুন গজানো কোঁড়ল ২-৩ মাসের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ বাঁশে পরিণত হয়। এছাড়া মুথা, কান্ড ছেদন ও কঞ্চি কলম এর সাহায্যে বোরাক বাঁশের বংশ বিস্তার ঘটে।

ছবি-১ (গ): বোরাক বাঁশের নতুন কোঁড়ল (বামে) এবং ফুল (ডানে)

চাষ পদ্ধতি ঃ গ্রামীণ বসত বাড়ি, পতিত জমি, খাল, নালা ও ছড়ার পাশে জুন-জুলাই মাসে সাধারণত ১-২ বছর বয়সের মুথা বা কঞ্চি কলম ২৫ ফুট X ২৫ ফুট দূরত্বে লাগিয়ে বোরাক বাঁশের চাষ করা হয়। লাগানো মুথা ও কঞ্চি কলমের জীবিতের হার শতকরা ৫০ ভাগ।

বাঁশের মড়ক ও দমন ব্যবস্থা ঃ বোরাক বাঁশ এক ধরনের ছত্রাক দ্বারা Bamboo blight নামক আগা মরা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। ঝাড়ের নতুন কোঁড়ল, কম বয়সী বাড়ন্ত বাঁশ ও বয়স্ক বাঁশের আগা ধীরে ধীরে পচে বাঁশটি শুকিয়ে যায় এবং ভেঙ্গে পড়ে বা ঝুলে থাকে। দমন ব্যবস্থা স্বরূপ আক্রান্ত বাঁশগুলো কেটে ফেলা এবং ঝাড়ের গোড়াতে জমে থাকা আবর্জনা ও শুকনো পাতা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এ ছাড়া ২০ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে নতুন গজানো কোঁড়ল এবং ঝাড়ের গোড়ার মাটিতে ভালোভাবে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে।

বাঁশের ফলন ও সংগ্রহণ পদ্ধতি ঃ বোরাক বাঁশের বার্ষিক ফলন হেক্টর প্রতি বাঁশের সংখ্যা ১,২০০-১,৭০০টি। মুথা লাগানোর ৫-৬ বছর এবং কঞ্চি কলম লাগানোর ৭-৮ বছর পর বাঁশ ঝাড় থেকে পরিপক্ক বাঁশ সংগ্রহ করা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার ঃ গৃহ নির্মাণের খুঁটি, আড়া, বীম, সিলিং ফ্রেম এবং বিল্ডিং নির্মাণকালে ছাদের সিলিং কাজে খুঁটি হিসেবে, মাছ ধরার সময় জাল ভাসিয়ে রাখার কাজে, সাঁকো নির্মাণে, আরোহণ মই, জমি চাষের মই ও গরু-মহিষের জোয়াল, রিক্সার হুড ফ্রেম ও কৃষি সরঞ্জামাদি নির্মাণে বোরাক বাঁশের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। কাগজ, হস্ত ও কুটির শিল্পে সৌখিন দ্রব্যাদি তৈরিতে বোরাক বাঁশ ব্যবহৃত হয়। বোরাক বাঁশের কোঁড়ল রান্না করে খাওয়া যায়। পাতা গবাদি পশুর উপাদেয় খাদ্য।

মিতিঙ্গা বাঁশ

পরিচিতি ঃ মিতিঙ্গা বাঁশ (*Bambusa burmanica*) অঞ্চলভেদে মিরতিঙ্গা, মহাল, তল্লা (রাজশাহী, টাঙ্গাইল), তরু বাঁশ ইত্যাদি নামে পরিচিত। এটি মাঝারি ধরনের গ্রামীণ ও বনজ বাঁশ। এটি দীর্ঘ খরা বিশিষ্ট এলাকায় জন্মাতে পারে এবং শুষ্ক তাপমাত্রায় সহনশীল। কচি কোঁড়ল মিষ্টি স্বাদ বিধায় তৃপ্তিকর খাবার হিসাবে বিবেচিত। নির্মাণ কাজে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান ঃ মিতিঙ্গা বাঁশ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেটের চিরসবুজ ও মিশ্র চিরসবুজ বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মাতে দেখা যায়। এছাড়া চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের গ্রামীণ এলাকায় লাগানো মিতিঙ্গা বাঁশের বিস্তৃতি রয়েছে।

ছবি-২: মিতিঙ্গা বাঁশের ঝাড়

পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য ঃ মিতিঙ্গা একটি মাঝারি ধরনের শক্ত ও পুরু প্রাচীরযুক্ত বাঁশ। এটি লম্বায় ৩০-৩৬ ফুট ও মোটায় ৩-৪ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। ঝাড়ের বাঁশগুলো পাতলা থেকে ঘনভাবে বিন্যস্ত। বাঁশের গোড়ার অংশ সবচেয়ে মোটা এবং কদাচিৎ গোড়ার গিঁটগুলোতে বায়বীয় মূল দেখা যায়। গিঁটগুলোর উপরের দিকে প্রায়ই সাদাটে রূপালি বলয় দেখা যায়। বাঁশ ঝাড়ে কদাচিৎ ১-২টি বাঁশের মধ্যপর্বে হলুদ বর্ণের লম্বালম্বি দাগ দেখা যায়। দুই গিঁটের মধ্যবর্তী স্থান লম্বায় ১০-১৬ ইঞ্চি এবং অভ্যন্তরভাগের ফাঁপা অংশ অপেক্ষাকৃত কম। গোড়ার দিকের গিঁটগুলোতে জন্মানো কঞ্চিগুলো পাতলা ও পত্রহীন এবং অন্যান্য গিঁটগুলোতে জন্মানো কঞ্চিগুলোর বিন্যাস ঘন গুচ্ছাকার। পাতা বেশ বড়, রেখাবৎ বল্লমাকৃতি, উপরের পৃষ্ঠ সবুজ এবং নিম্ন পৃষ্ঠ সাদাটে ও মখমল ভেলভেটের মতো। বাঁশ ঝাড়ে জন্মানো কোঁড়লগুলো হলদে-সবুজ বর্ণের বা কদাচিৎ হলদে দাগযুক্ত। কোঁড়লের সীথগুলোর উপরি পৃষ্ঠ বাদামি-কালচে রোমাবৃত ও সাদা কুঁড়োযুক্ত এবং নিম্ন পৃষ্ঠ রোমশহীন মসৃণ। এ প্রজাতির বাঁশে বহু বছর পর কঞ্চিগুলোতে গুচ্ছাকারে ফুল ধরে এবং ৩ বছর যাবৎ প্রচুর ফুল-ফল দিয়ে অবশেষে ঝাড়ের সকল বাঁশ মারা যায়। বীজ দেখতে অনেকটা গমের মতো। বীজের প্রাপ্তি খুবই ক্ষীণ।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার ঃ প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে প্রাকৃতিকভাবে বাঁশ ঝাড়ের বাহিরের দিকে নতুন কোঁড়ল জন্মায় এবং বাঁশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নতুন গজানো কোঁড়ল ২-৩ মাসের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ বাঁশে পরিণত হয় । এছাড়া মুথা, কান্ড ছেদন, গিঁট কলম, কঞ্চি কলম এবং বীজের সাহায্যে মিতিঙ্গা বাঁশের বংশ বিস্তার ঘটে।

চাষ পদ্ধতি ঃ গ্রামীণ বসত বাড়ি, পতিত জমি, খাল, নালা ও ছড়ার পাশে জুন-জুলাই মাসে সাধারণত ১-২ বছর বয়সের মুথা বা কঞ্চি কলম ২৫ ফুট X ২৫ ফুট দূরত্বে লাগিয়ে মিতিঙ্গা বাঁশের চাষ করা হয়।

বাঁশের ফলন ও সংগ্রহণ পদ্ধতি ঃ মুথা লাগানোর ৪-৫ বছর পর বাঁশের ঝাড় থেকে পরিপক্ক বাঁশ সংগ্রহ করা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার ঃ গৃহ নির্মাণে ঘরের খুঁটি, বেড়া ও সিলিং প্রদান এবং গৃহস্থালি ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি, ঝুড়ি, মাদুর ও কাগজ শিল্পে মিতিঙ্গা বাঁশের ব্যবহার রয়েছে। মিতিঙ্গা বাঁশ কৃষি ক্ষেত-খামারের চারিধারে বেড়া হিসেবে লাগানো হয়। কচি কোঁড়ল মিষ্টি স্বাদ বিধায় তৃপ্তিকর উপাদেয় খাবার হিসেবে বিবেচিত। এটি কাঁচা এবং রান্না করে খাওয়া যায়।

ফারুয়া বা বার্মা বাঁশ

পরিচিতি ঃ ফারুয়া বাঁশ (*Bambusa polymorpha*) অঞ্চলভেদে বড় তল্লা (ঢাকা), বার্মা বাঁশ (চট্টগ্রাম) ইত্যাদি নামে পরিচিত। এটি একটি মাঝারি থেকে বড় আকারের গ্রামীণ ও বনজ বাঁশ। নির্মাণ কাজে ও হস্ত শিল্পজাত পণ্য তৈরিতে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। ফারুয়া বাঁশের কোঁড়ল মিষ্টি স্বাদের হওয়ায় সব্জি হিসেবে রান্না করে খাওয়া হয়। বসত বাড়ির আঙ্গিনা ও বাগানের সৌন্দর্য শোভাবর্ধনকারী হিসেবে ফারুয়া বাঁশ লাগানো হয়।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান ঃ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটের পাহাড়ি বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো ফারুয়া বাঁশের বিস্তৃতি রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট (চট্টগ্রাম) ও ঢাকার মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস এলাকায় লাগানো ফারুয়া বাঁশ দেখা যায়। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে শোভাবর্ধনকারী গাছ হিসেবে বসত বাড়ির আঙ্গিনায় ফারুয়া বাঁশ লাগিয়ে থাকেন।

পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য ঃ ফারুয়া একটি মাঝারি থেকে বড় আকারের শক্ত ও পুরু প্রাচীরযুক্ত সুশ্রী বাঁশ। এটি লম্বায় ৪৫-৬০ ফুট ও মোটায় ৪-৬ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। ঝাড়ের বাঁশগুলো অত্যন্ত ঘনভাবে বিন্যস্ত। বাঁশের গোড়ার অংশ মোটা এবং গোড়ার গিঁটগুলোতে হালকাভাবে জন্মানো ছোট বায়বীয় মূল দেখা যায়। কচি বাঁশের গায়ে সাদাটে পাউডারযুক্ত হালকা রোম দেখা যায় এবং পরিপক্ক বাঁশে বাদামি বর্ণের পাউডার থাকে। দুই গিঁটের মধ্যবর্তী স্থান লম্বায় ১৬-২৫ ইঞ্চি এবং অভ্যন্তরভাগের ফাঁপা অংশ কম। গোড়ার দিকে সচরাচর কঞ্চি জন্মায় না, তবে মাঝখান থেকে আগা পর্যন্ত গিঁটগুলোতে গুচ্ছাকারে ১-৩টি শক্ত কঞ্চি জন্মায় এবং মাঝের কঞ্চিটি আকারে বড়। পাতা বেশ সরু, রেখাবৎ ও বল্লমাকৃতি এবং ঘনভাবে সজ্জিত। বাঁশ ঝাড়ে জন্মানো কোঁড়লগুলো উজ্জ্বল বাদামি-সবুজ বর্ণের। কোঁড়লের সীথগুলোর উপরি পৃষ্ঠ কালচে-বাদামি রোমাবৃত, নিম্ন পৃষ্ঠ রোমশহীন মসৃণ এবং সীথগুলো সহসা খসে পড়ে না। এ প্রজাতির বাঁশে ৫৫-৬০ বছর পর ফুল-ফল ধরে এবং ৩ বছর যাবৎ প্রচুর ফুল-ফল দিয়ে অবশেষে ঝাড়ের সকল বাঁশ মারা যায়।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার ঃ প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে প্রাকৃতিকভাবে বাঁশ ঝাড়ের বহির্ভাগে বাঁশের কোঁড়ল জন্মায় এবং বাঁশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নতুন গজানো কোঁড়ল ২-৩ মাসের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ বাঁশে পরিণত হয়। এ ছাড়া মুথা, কাণ্ড ছেদন, কঞ্চি কলম ও বীজের সাহায্যে ফারুয়া বাঁশের বংশ বিস্তার হয়।

ছবি-৩: ফারুয়া বাঁশের ঝাড়

চাষ পদ্ধতি ঃ সাধারণত মুথা বা কঞ্চি কলম লাগিয়ে ফারুয়া বাঁশের চাষাবাদ করা হয়। গ্রামীণ ও শহর এলাকায় বসত বা বাগান বাড়িতে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শোভাবর্ধনকারী হিসেবে বর্ষা মৌসুমে ১-২ বছর বয়সের মুথা বা কঞ্চি কলম ২৫ ফুট x ২৫ ফুট দূরত্বে ফারুয়া বাঁশ লাগানো হয়।

বাঁশের ফলন ও সংগ্রহণ পদ্ধতি ঃ ফারুয়া বাঁশ একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। ফারুয়া বাঁশের বার্ষিক ফলন হেক্টর প্রতি ২০ থেকে ৩০ টন। মুথা লাগানোর ৫-৬ বছর এবং কঞ্চি কলম লাগানোর ৭-৮ বছর পর বাঁশের ঝাড় থেকে পরিপক্ক বাঁশ সংগ্রহ করা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার ঃ ফারুয়া বাঁশের ভার বহনের ক্ষমতা বেশি, সহজে ভেঙ্গে পড়ে না। নির্মাণ কাজে, গ্রামীণ ঘর তৈরিতে খুঁটি, আড়া, বীম ও বেড়া, ঝুড়ি, আসবাবপত্র, হস্ত শিল্পজাত পণ্য, কাগজ ও বোর্ড তৈরির কাজে ফারুয়া বাঁশ ব্যবহৃত হয়। পাতা গবাদি পশুর উপাদেয় খাদ্য।

তল্লা বাঁশ

পরিচিতি ঃ তল্লা বাঁশ (*Bambusa tulda*) অঞ্চলভেদে তরলা, আইলি, কেয়িত্তা বাঁশ ইত্যাদি নামে পরিচিত। এটি একটি মাঝারি আকৃতির অতি পরিচিত গ্রামীণ বাঁশ। নির্মাণ কাজে ও হস্ত শিল্পজাত পণ্য তৈরিতে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। কচি কোঁড়ল স্বাদে হালকা তিতা।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান ঃ সারা দেশব্যাপী তল্লা বাঁশের কম-বেশি বিস্তৃতি রয়েছে। তবে বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরিশাল ও পটুয়াখালীর গ্রামীণ এলাকায় লাগানো তল্লা বাঁশের বিস্তৃতি বেশি। এটি পাহাড়ি মিশ্র চিরসবুজ বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মাতে দেখা যায়।

পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য ঃ তল্লা একটি মাঝারি আকৃতির পাতলা প্রাচীরযুক্ত এবং পাতলা গিঁটযুক্ত বাঁশ। এটি লম্বায় ১৮-৩৬ ফুট ও মোটায় ৩-৪ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। ঝাড়ের বাঁশগুলো ঘনভাবে বিন্যস্ত। বাঁশের গিঁটগুলোর উপরিভাগে সাদাটে লোমশযুক্ত একটি বন্ধনী বা বলয় রয়েছে। নিচ থেকে উপর পর্যন্ত গিঁটগুলোতে একাধিক কঞ্চি জন্মায়। দুই গিঁটের মাঝের স্থান লম্বায় ১২-২৪ ইঞ্চি এবং অভ্যন্তরভাগের ফাঁপা অংশ বেশি। পাতা বল্লমাকৃতি এবং উর্ধমুখী তির্যকভাবে বিন্যস্ত। বাঁশ ঝাড়ে জন্মানো কোঁড়লগুলো সবুজ বর্ণের। কোঁড়লের সীথগুলোর উপরি পৃষ্ঠ কালচে বাদামি রোমাবৃত, নিম্ন পৃষ্ঠ রোমশহীন মসৃণ এবং সীথগুলো খসে পড়ে। এ প্রজাতির বাঁশে ২৫-৪০ বছর পর ফুল-ফল ধরে এবং ২ বছর যাবৎ প্রচুর ফুল-ফল দিয়ে অবশেষে ঝাড়ের সকল বাঁশ মারা যায়। বীজের প্রাপ্তি বিরল।

ছবি-৪: তল্লা বাঁশের ঝাড়

প্রজনন ও বংশ বিস্তার ঃ প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে প্রাকৃতিকভাবে বাঁশ ঝাড়ের বহির্ভাগে বাঁশের কোঁড়ল জন্মায় এবং বাঁশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নতুন গজানো কোঁড়ল ২-৩ মাসের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ বাঁশে পরিণত হয়। এ ছাড়া মুথা, কান্ড ছেদন ও বীজের সাহায্যে তল্লা বাঁশের বংশ বিস্তার হয়।

চাষ পদ্ধতি ঃ সাধারণত মুথা লাগিয়ে তল্লা বাঁশের চাষাবাদ করা হয়। গ্রামীণ এলাকায় বর্ষা মৌসুমে ১-২ বছর বয়সের মুথা ২৫ ফুট X ২৫ ফুট দূরত্বে তল্লা বাঁশ লাগানো হয়। মাঠ পর্যায়ে লাগানো মুথার জীবীতের হার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ।

বাঁশের ফলন ও সংগ্রহণ পদ্ধতি ঃ তল্লা বাঁশের বার্ষিক ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ৩ টন। মুথা লাগানোর ৫-৭ বছর পর বাঁশের ঝাড় থেকে পরিপক্ক বাঁশ সংগ্রহ করতে হবে।

গুরুত্ব ও ব্যবহার ঃ গৃহ নির্মাণের খুঁটি ও বেড়া, আসবাবপত্র, ঝুড়ি, হস্ত শিল্পের কাঁচামাল, কঞ্চি দ্বারা চাঁচ ও দরমা দ্রব্যাদি তৈরি, রান্না ঘরে তরি-তরকারি রাখার পাত্র, দেশিয় মাদুর, শস্য দানা রাখার পাত্র ও কাগজের মন্ডসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরিতে মিতিঙ্গা বাঁশ ব্যবহৃত হয়। কচি কোঁড়ল স্বাদে হালকা তিতা। পাতা গবাদি পশুর উপাদেয় খাদ্য।

বাইজ্যা বা বারিয়ালা বাঁশ

পরিচিতি ঃ বাইজ্যা বাঁশ (*Bambusa vulgaris*) অঞ্চলভেদে বারিয়ালা (পার্বত্য চট্টগ্রাম), বারগিয়া, বাঁশিনি, বাঁশনী, জাই বা জাওয়া বাঁশ (যশোর), ওরা (ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল), বস্তি বাঁশ (সিলেট), বালনা বড় বাঁশ, বাংলা বাঁশ ইত্যাদি নামে পরিচিত। এটি একটি বড় আকৃতির গ্রামীণ বাঁশ। গৃহ ও কৃষি সরঞ্জামাদি নির্মাণে বাইজ্যা বাঁশের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। কচি কোঁড়ল রান্না করে খাওয়া যায়।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান ঃ সারা দেশব্যাপী বাইজ্যা বাঁশের কম-বেশি বিস্তৃতি রয়েছে। তবে দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের জেলাগুলোতে বাইজ্যা বাঁশের বিস্তৃতি বেশি। যশোর, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলাসমূহে বাইজ্যা বাঁশের বিস্তৃতি বেশি দেখা যায়।

পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য ঃ বাইজ্যা একটি বড় আকৃতির শক্ত, পুরু প্রাচীরযুক্ত ও ঘন গিঁটযুক্ত বাঁশ। এটি লম্বায় ৩০-৬০ ফুট ও মোটায় ৪-৬ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। ঝাড়ের বাঁশগুলো ঘনভাবে বিন্যস্ত এবং বাঁশের মাথাগুলো নিম্নমুখীভাবে ঝুলে থাকে। বাঁশের গোড়ার অংশ একটু সরু, মাঝখানটা সবচেয়ে মোটা এবং পুনরায় আগার অংশ ক্রমান্বয়ে সরু। গোড়ার অংশের কয়েকটি গিঁটে ছোট বায়বীয় মূল দেখা যায়। দুই গিঁটের মাঝের স্থান লম্বায় ৮-১৮ ইঞ্চি এবং অভ্যন্তরভাগের ফাঁপা অংশ বেশি। গোড়ার দিকের গিঁটগুলোতে কোন কঞ্চি জন্মায় না। তবে মাঝামাঝি জায়গায় গিঁট থেকে উপর পর্যন্ত গিঁট গুলোতে সচরাচর একত্রে অনেকগুলো শক্ত কঞ্চি বের হয় এবং মাঝখানের কঞ্চিটি আকারে বড়। পাতা বল্লমাকৃতি ও খসখসে ধরনের। বাঁশ ঝাড়ে জন্মানো কোঁড়লগুলো গাঢ় বাদামি থেকে হলদে সবুজ বর্ণের। কোঁড়লের সীথগুলোর উপরি পৃষ্ঠ উজ্জ্বল কালচে রোমাবৃত, নিম্ন পৃষ্ঠ রোমশহীন মসৃণ এবং সীথগুলো খসে পড়ে। বাইজ্যা বাঁশে কদাচিৎ ফুল দেখা গেলেও বীজ পাওয়া যায় না।

ছবি-৫ (ক): বাইজ্যা বাঁশের ঝাড় (বামে) এবং গিঁটে মাঝের কঞ্চিটি আকারে বড় (ডানে)

ছবি-৫ (খ): বাইজ্যা বাঁশে ফুল, তবে বীজ পাওয়া যায় না।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার ঃ প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে প্রাকৃতিকভাবে বাঁশ ঝাড়ের গোড়ার বহির্ভাগে কোঁড়ল জন্মায় এবং বাঁশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নতুন গজানো কোঁড়ল ২-৩ মাসের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ বাঁশে পরিণত হয়। এ ছাড়া মুথা, কান্ড ছেদন, গিঁট কলম, কঞ্চি কলম ও ভূমির মাটিতে আবদ্ধকৃত গুটি কলমের সাহায্যে বংশ বিস্তার করা হয়।

চাষ পদ্ধতি ঃ সাধারণত মুথা বা কঞ্চি কলম লাগিয়ে বাইজ্যা বাঁশের চাষাবাদ করা হয়। গ্রামীণ এলাকায় বসত বাড়িতে, পতিত জমিতে, নদী, খাল, নালা ও ছড়ার পাশে বর্ষা মৌসুমে ১-২ বছর বয়সের মুথা বা কঞ্চি কলম ২৫ ফুট X ২৫ ফুট দূরত্বে বাইজ্যা বাঁশ লাগানো হয়। মাঠ পর্যায়ে লাগানো মুথা ও কঞ্চি কলমের জীবিতের হার শতকরা ৮০-৯০ ভাগ।

বাঁশের মড়ক ও দমন ব্যবস্থা ঃ বাইজ্যা বাঁশ এক ধরনের ছত্রাক দ্বারা bamboo blight নামক আগা মরা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। ঝাড়ের নতুন কোঁড়ল, কম বয়সী বাড়ন্ত বাঁশ ও বয়স্ক বাঁশের

আগা ধীরে ধীরে পচে বাঁশটি শুকিয়ে যায় এবং ভেঙ্গে পড়ে বা ঝুলে থাকে। দমন ব্যবস্থা স্বরূপ আক্রান্ত বাঁশগুলো কেটে ফেলা এবং ঝাড়ের গোড়াতে জমে থাকা আবর্জনা ও শুকনো পাতা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এ ছাড়া ২০ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে নতুন গজানো কোঁড়ল এবং ঝাড়ের গোড়ার মাটিতে ভালোভাবে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে।

বাঁশের ফলন ও সংগ্রহণ পদ্ধতি ঃ বাইজ্যা বাঁশ একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। মুথা লাগানোর ৩-৪ বছর এবং কঞ্চি কলম লাগানোর ৫-৭ বছর পর বাঁশের ঝাড় থেকে পরিপক্ক বাঁশ সংগ্রহ করা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার ঃ গৃহ নির্মাণের খুঁটি, আড়া, বীম, চালা ও সিলিং ফ্রেম এবং বিল্ডিং নির্মাণকালে ছাদের সিলিং কাজে খুঁটি হিসেবে, কলা গাছের ঠেস খুঁটি হিসেবে, মাছ ধরার সময় জাল ভাসিয়ে রাখার কাজে, সাঁকো নির্মাণে, আরোহণকৃত মই, জমি চাষের মই ও গরু-মহিষের জোয়াল, রিক্সার হুড ফ্রেম, আধিবাসীদের ধুমপান করার পাইপ, পানি সেচের পাইপ, আসবাবপত্র, ঝুড়ি ও কৃষি সরঞ্জামাদি নির্মাণে বাইজ্যা বাঁশের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। কাগজ শিল্পে এবং সৌখিন দ্রব্যাদি তৈরিতে বাইজ্যা বাঁশ ব্যবহৃত হয়। কচি কোঁড়ল রান্না করে খাওয়া যায়। পাতা গবাদি পশুর উপাদেয় খাদ্য।

বুদুম বা ভুদুম বাঁশ

পরিচিতি ঃ বুদুম বাশ (*Dendrocalamus gigannteus*) অঞ্চলভেদে ভুদুম বাঁশ, কাঞ্চ বাঁশ, রাজা বাঁশ, বিদেশি বাঁশ, ড্রাগন বাঁশ ইত্যাদি নামে পরিচিত। এটি বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহৎ আকৃতির বাঁশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিজস্ব বাঁশ হিসেবে পরিচিত। এ প্রজাতির বাঁশকে ১,২০০ মিটার উচ্চতায় পাহাড় ও পাহাড়ের ঢালুতে জন্মাতে দেখা যায়। এ বাঁশের কোঁড়ল সবজি হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান ঃ বুদুম বাঁশের বিস্তৃতি রয়েছে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের গ্রামীণ এলাকায়, বসত বাড়ির আঙ্গিনাতে এবং বুদ্ধদের গীর্জাগুলোতে। এ ছাড়া চট্টগ্রামের বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউটের বাঁশ উদ্যানে, ঢাকার মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানসহ বিনোদনমূলক পার্কসমূহ এবং দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস এলাকায় লাগানো বুদুম বাঁশের বিস্তৃতি রয়েছে।

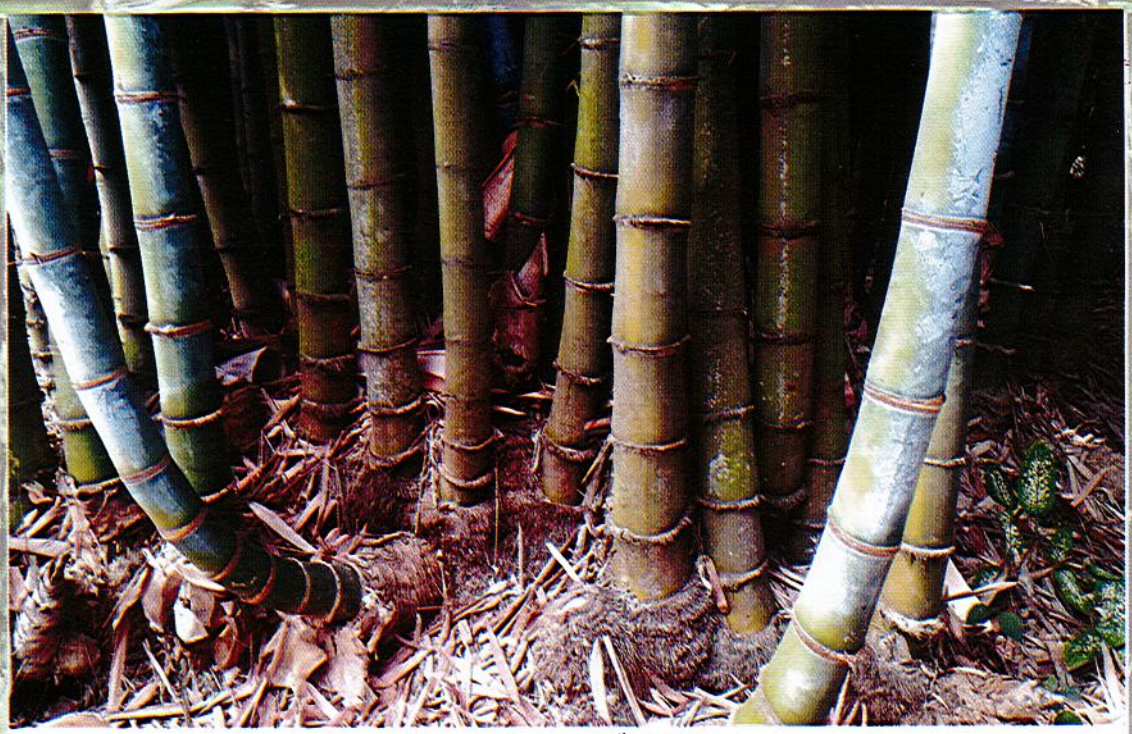

ছবি-৬ (ক) : বুদুম বাঁশের ঝাড়

ছবি-৬ (খ) : বুদুম বাঁশের কঞ্চি (বামে) এবং পাতা (ডানে)

পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য ঃ বুদুম বাঁশ একটি বৃহৎ আকৃতির শক্ত, পুরু, প্রাচীরযুক্ত এবং স্বল্প কঞ্চি বিশিষ্ট বাঁশ। এটি লম্বায় ৯০-১২০ ফুট ও মোটায় ৬-১৪ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। ঝাড়ের বাঁশগুলো মধ্যম ঘনভাবে বিন্যস্ত। বাঁশের গোড়ার দিকের কয়েকটি গিঁটে হালকাভাবে জন্মানো ছোট বায়বীয় মূল দেখা যায়।

কচি বাঁশ সাদাটে পাউডারযুক্ত। দুই গিঁটের মাঝের স্থান লম্বায় ১৪-১৮ ইঞ্চি এবং অভ্যন্তরভাগের ফাঁপা অংশ বেশি। গোড়ার দিকের গিঁটগুলোতে কোনো কঞ্চি জন্মায় না, তবে আগার দিকে কঞ্চিগুলো বেশ বিস্তৃত। গিঁটগুলোতে একত্রে ৩-৪টি শক্ত কঞ্চি বের হয় এবং মাঝখানের কঞ্চিটি আকারে বড়। পাতা বেশ বড়, বল্লমাকৃতি ও খসখসে ধরনের। বাঁশ ঝাড়ে জন্মানো কোঁড়লগুলো কালচে-বেগুনি বর্ণের। কোঁড়লের সীথগুলো আকারে বড়, সীথের উপরি পৃষ্ঠ ঘন সোনালি ও বাদামি বর্ণের রোমাবৃত, নিম্ন পৃষ্ঠ রোমশহীন মসৃণ এবং সীথগুলো খসে পড়ে। বুদুম বাঁশে প্রায় ৪০ বছর পর পর ফুল-ফল আসে এবং ৩ বছর যাবৎ প্রচুর ফুল-ফল দিয়ে অবশেষে ঝাড়ের সকল বাঁশ মারা যায়। সম্প্রতি কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায় বুদুম বাঁশে বিক্ষিপ্তভাবে ফুল-ফল ধরেছে। বীজ গমের মতো, তবে বীজের প্রাপ্তি পর্যাপ্ত নয়।

ছবি-৬ (গ): বুদুম বাঁশের কঞ্চিতে ফুল (বামে) এবং প্রস্ফুটিত ফুল (ডানে)

প্রজনন ও বংশ বিস্তার ঃ প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে প্রাকৃতিকভাবে বাঁশ ঝাড়ের বহির্ভাগে কোঁড়ল জন্মায় এবং বাঁশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উপযুক্ত পরিবেশে নতুন গজানো বাঁশ প্রতিদিন গড়ে ১৬ ইঞ্চি হারে বৃদ্ধি পায় এবং ৩-৪ মাসের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ বাঁশে পরিণত হয়। এ ছাড়া মুথা, কান্ড ছেদন, কঞ্চি কলম ও বীজের সাহায্যে বংশ বিস্তার হয়।

চাষ পদ্ধতি ঃ সাধারণত মুথা বা কঞ্চি কলম লাগিয়ে বুদুম বাঁশের চাষাবাদ করা হয়। গ্রামীণ ও শহর এলাকায়, বিনোদনমূলক পার্কসমূহ, বসত বাড়ির আঙ্গিনাতে এবং দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শোভাবর্ধনকারী হিসেবে বর্ষা মৌসুমে ১-২ বছর বয়সের মুথা বা কঞ্চি কলম ৩০ ফুট X ৩০ ফুট দূরত্বে লাগানো হয়। মাঠ পর্যায়ে লাগানো মুথা ও কঞ্চি কলমের জীবীতের হার শতকরা ৮০-৯০ ভাগ।

বাঁশের ফলন ও সংগ্রহণ পদ্ধতি ঃ বুদুম বাঁশ একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। বুদুম বাঁশের বার্ষিক ফলন হেক্টর প্রতি ২০ থেকে ৩০ টন। মুথা লাগানোর ৩-৪ বছর এবং কঞ্চি কলম লাগানোর ৫-৭ বছর পর বাঁশের ঝাড় থেকে পরিপক্ক বাঁশ সংগ্রহ করা হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার ঃ গৃহ নির্মাণের খুঁটি, আড়া, বীম, বেড়া এবং মাছ ধরার সময় জাল ভাসিয়ে রাখার কাজে, সাঁকো বা ব্রীজ ও মই নির্মাণে বুদুম বাঁশ ব্যবহৃত হয়। নৌকা বা জাহাজে পাল তোলার খুঁটি, ফ্লোর টাইলস্, আসবাবপত্র তৈরি ও পানির পাইপ হিসেবে বুদুম বাঁশের ব্যবহার রয়েছে। পাহাড়ি এলাকার আদিবাসীরা বুদুম বাঁশের গিঁটযুক্ত স্থান কেটে পাত্র বানিয়ে পানি ও গৃহস্থলী জিনিষপত্র রাখার কাজে ব্যবহার করে থাকে। পাতা গবাদি পশুর উপাদেয় খাদ্য এবং ঘরের ছাউনিতে ব্যবহৃত হয়। কোঁড়লের সীথ দিয়ে মাথার টুপি বানানো হয়। বাঁশের কোঁড়ল সবজি হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়।

ওরা বা তরু বাঁশ

পরিচিতি ঃ ওরা বাঁশ (*Dendrocalamus longispathus*) অঞ্চলভেদে রূপাই, খাগ বাঁশ (সিলেট), ওরা, ওরালি (চট্টগ্রাম), তরু (কক্সবাজার), কাইয়া-তল্লা বাঁশ, ফার্বাহ বানয (চাকমা), টরুগু ওয়াআহ (মার্মা), ইয়াহামিলিয়া ইয়াহা (ত্রিপুরা), রিনাল মাউ (বাওম) ইত্যাদি নামে পরিচিত। এটি একটি দেশিয় প্রজাতির মাঝারি আকৃতির বনজ বাঁশ। এ বাঁশের কচি কোঁড়ল সবজি হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান ঃ ওরা বাঁশের বিস্তৃতি রয়েছে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট বনাঞ্চলের আর্দ্রযুক্ত পাহাড়ি ঢালুতে এবং নালা-ছড়ার কিনারা ঘেষে। এ প্রজাতির বাঁশ চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাঁশ উদ্যানে এবং ঢাকার মিরপুর জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে সংরক্ষিত আছে।

ছবি-৭ (ক): ওরা বাঁশের ঝাড়

পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য ঃ ওরা একটি মাঝারি আকৃতির ও পুরু প্রাচীরযুক্ত সরু লম্বাটে বাঁশ। এটি লম্বায় ৩০-৬০ ফুট ও মোটায় ৩-৪ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। ঝাড়ের বাঁশগুলো মধ্যম ঘনভাবে বিন্যস্ত। বাঁশের গোড়ার অংশ সবচেয়ে মোটা এবং গোড়ার অংশের কতিপয় গিঁটগুলোতে কদাচিং বায়বমূল দেখা যায়। দুই গিঁটের মাঝের স্থান লম্বায় ১০-২০ ইঞ্চি এবং অভ্যন্তরভাগের ফাঁপা অংশ বেশি। বাঁশের গোড়ার গিঁটগুলোতে কঞ্চি জন্মায় না, তবে আগার দিকের গিঁটগুলোতে কঞ্চি জন্মায়। পাতা ছোট এবং বল্লমাকৃতি থেকে রেখাবৎ-বল্লমাকৃতি। বাঁশ ঝাড়ে জন্মানো কোঁড়লগুলো হলদে-সবুজ বর্ণের। কোঁড়লের সীথগুলো বেশি লম্বা ও চোঙ্গাকৃতি, উপরি পৃষ্ঠ কালচে-বাদামি বর্ণের রোমাবৃত, নিম্ন পৃষ্ঠ রোমশহীন মৃসণ এবং সীথগুলো খসে পড়ে না। ওরা বাঁশে ৩৫-৪০ বছর পর ফুল-ফল আসে

এবং ২-৩ বছর যাবৎ প্রচুর ফুল-ফল দিয়ে অবশেষে ঝাড়ের সকল বাঁশ মারা যায়। চট্টগ্রামের বিভিন্ন বন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে ওরা বাঁশের ফুল-ফল ধরেছে। বীজ দেখতে গমের মতো, বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো বুনো চারা পাওয়া যায়।

ছবি-৭ (খ): ওরা বাঁশের ফুল (বামে) এবং কঞ্চিতে প্রস্ফুটিত ফুল (ডানে)

প্রজনন ও বংশ বিস্তার ঃ প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে প্রাকৃতিকভাবে বাঁশ ঝাড়ের গোড়ার চারিদিকে কোঁড়ল জন্মায় এবং বাঁশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নতুন গজানো বাঁশ ৩-৪ মাসের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ বাঁশে পরিণত হয়। এ ছাড়া মুথা, কান্ড ছেদন, গিঁট কলম, কঞ্চি কলম ও বীজের সাহায্যে ওরা বাঁশের বংশ বিস্তার হয়।

চাষ পদ্ধতি ঃ সাধারণত মুথা লাগিয়ে ওরা বাঁশের চাষাবাদ করা হয়। গ্রামীণ এলাকায় বসত বাড়ি এবং পতিত জমিতে বর্ষা মৌসুমে ১-২ বছর বয়সের মুথা ২৫ ফুট X ২৫ ফুট দূরত্বে ওরা বাঁশ লাগানো হয়। মাঠ পর্যায়ে লাগানো মুথার জীবীতের হার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ।

বাঁশের ফলন ও সংগ্রহণ পদ্ধতি ঃ নতুন গজানো ওরা বাঁশের দৈনিক বৃদ্ধির হার প্রায় ১২ ইঞ্চি হয়ে থাকে। মুথা লাগানোর ৩-৪ বছর পর বাঁশের ঝাড় থেকে পরিপক্ক বাঁশ সংগ্রহ করা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার ঃ ওরা বাঁশ অস্থায়ী নির্মাণ কাজে, আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, ঝুড়ি, মাদুর, হস্ত শিল্পে, সৌখিন দ্রব্যাদি,দাঁতের খিলন (টুথ পিক), জ্বালানি, কাগজ ও কাগজের মন্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বাঁশের কচি কোঁড়ল সব্জিরূপে রান্না করে খাওয়া যায়।

কালি বা কালিছড়ি বাঁশ

পরিচিতি ঃ কালি বাঁশ (*Gigantochloa andamanica*) অঞ্চলভেদে কালিছড়ি বাঁশ (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম), কালিয়া (সিলেট), কালিসেরি, কালিজরি ইত্যাদি নামে পরিচিত। এটি মাঝারি আকৃতির বনজ বাঁশ। রান্নার কাজের তৈজসপত্র ও ঘরের বেড়া নির্মাণে কালি বাঁশের ব্যবহার রয়েছে। কচি কোঁড়ল খাওয়া যায় তবে স্বাদে কিছুটা তিতা ধরনের।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান ঃ প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো কালি বাঁশের বিস্তৃতি রয়েছে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট বনাঞ্চলের আর্দ্রযুক্ত পাহাড়ি ঢালুতে এবং নালা-ছড়ার কিনারা ঘেষে। এ প্রজাতির বাঁশ চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাঁশ উদ্যানে এবং ঢাকার মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে সংরক্ষিত আছে।

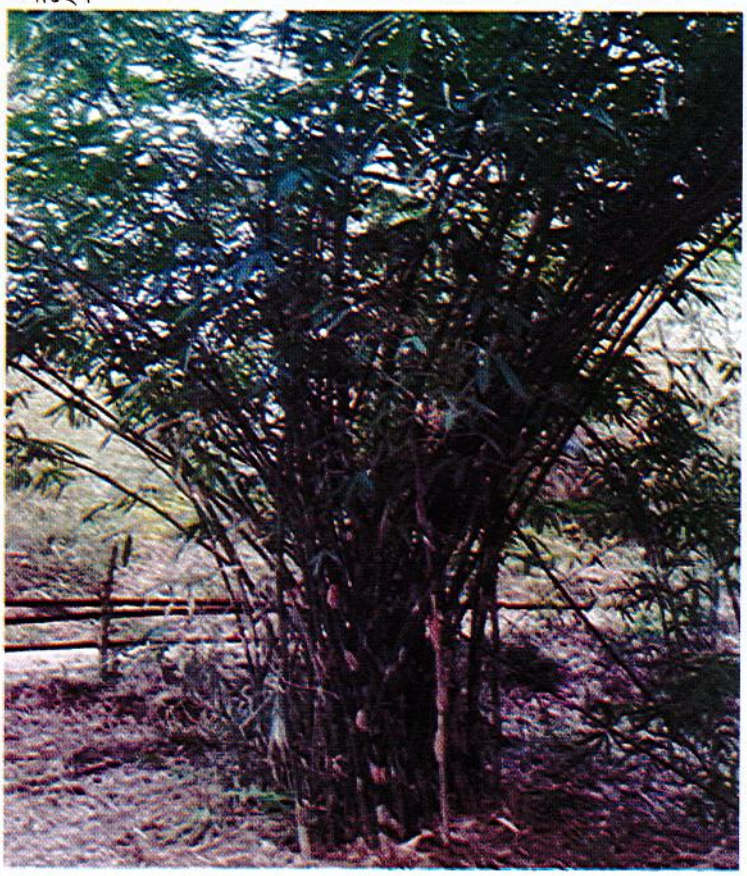

ছবি-৮ (ক): কালি বাঁশের ঝাড়

পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য ঃ কালি একটি মাঝারি আকৃতির, আংশিক নমনীয়, গুল্মবৎ থেকে ছোট বৃক্ষবৎ ঝোপের মতো হেলানো বা বাঁকানো ও পুরু প্রাচীরযুক্ত বাঁশ। এটি লম্বায় ৪৫-৬০ ফুট ও মোটায় ১.৫-২.৫ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। ঝাড়ের বাঁশগুলো হালকাভাবে ঘন বিন্যস্ত। বাঁশের গোড়ার অংশ সবচেয়ে মোটা এবং গোড়ার অংশের গিঁটগুলোর বায়বমূল দেখা যায়। গিঁটগুলোতে উপরে ও নিচে বাদামি রোমের অস্পষ্ট বলয় রয়েছে। দুই গিঁটের মাঝের স্থান লম্বায় ৮-১৪ ইঞ্চি এবং অভ্যন্তরভাগের ফাঁপা অংশ অত্যন্ত সরু। বাঁশের গোড়ার দিকের গিঁটগুলোতে কঞ্চি জন্মায় না, মাঝের ও আগার দিকের গিঁটগুলোতে গুচ্ছাকারে কঞ্চি জন্মায়। জন্মানো কঞ্চিগুলোর মাঝখানের কঞ্চিটি বেশ বড় ও শক্ত ধরনের। পাতা প্রথমাবস্থায় বেশ বড়, বল্লমাকৃতি এবং গাঢ় কালচে সবুজ বর্ণের। বাঁশ ঝাড়ে জন্মানো কোঁড়লগুলো বর্ণে কালচে-সবুজ ও কালো রোমাবৃত। সীথগুলোর উপরি পৃষ্ঠ কালো রোমশ ও কালো কুড়োযুক্ত, নিম্ন পৃষ্ঠ রোমশহীন মৃসণ এবং সীথগুলো আংশিক খসে পড়ে। কালি বাঁশে ফুল ও ফল আসে বহু বছর পরে এবং ২-৩ বছর যাবৎ প্রচুর ফুল-ফল দিয়ে ঝাড়ের সকল বাঁশ মারা যায়। বীজ দেখতে গমের মতো।

ছবি-৮ (খ): কালি বাঁশের বীজ

প্রজনন ও বংশ বিস্তার ঃ প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে প্রাকৃতিকভাবে বাঁশ ঝাড়ের চারিদিকে কোঁড়ল জন্মায় এবং বাঁশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নতুন গজানো কোঁড়ল ৩-৪ মাসের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ বাঁশে পরিণত হয়। এছাড়া মুথা, কান্ড ছেদন, গিট কলম, কঞ্চি কলম ও বীজের সাহায্যে কালি বাঁশের বংশ বিস্তার হয়।

চাষ পদ্ধতি ঃ সাধারণত মুথা বা কঞ্চি কলম লাগিয়ে কালি বাঁশের চাষাবাদ করা হয়। গ্রামীণ বসত বাড়ি, পতিত জমি এবং বন এলাকায় বর্ষা মৌসুমে ২৫ ফুট x ২৫ ফুট দূরত্বে কালি বাঁশের ১-২ বছর বয়সের মুথা বা কঞ্চি কলম লাগানো হয়। মাঠ পর্যায়ে লাগানো মুথা ও কঞ্চি কলমের জীবিতের হার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ।

বাঁশের ফলন ও সংগ্রহণ পদ্ধতি ঃ কালি বাঁশের মুথা লাগানোর ৩-৪ বছর পর বাঁশের ঝাড় থেকে পরিপক্ক বাঁশ সংগ্রহ করা যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার ঃ রান্নার কাজের তৈজসপত্র, ভেলা তৈরি, ঘরের বেড়া নির্মাণ, ঝুড়ি ইত্যাদি তৈরিতে কালি বাঁশের ব্যবহার রয়েছে। কচি কোঁড়ল স্বাদে কিছুটা তিতা ধরনের।

মুলি বা পাইয়া বাঁশ

পরিচিতি ঃ মুলি বাঁশ (*Melocanna baccifera*) অঞ্চলভেদে পাইয়া, মুলি (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম), নালি (ঢাকা, ময়মনসিংহ) ইত্যাদি নামে পরিচিত। এটি একটি মাঝারি আকৃতির বনজ বাঁশ। গৃহ নির্মাণে, গৃহস্থালির ও কুটির শিল্পজাত পণ্য এবং কাগজ তৈরিতে মুলির ব্যবহার বেশি। মুলি বাঁশের কোঁড়ল সুস্বাদু বিধায় পাহাড়ি অঞ্চলে কোঁড়ল সবজি হিসাবে রান্না করে খায় এবং বাজারজাত করে থাকে।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান ঃ প্রাকৃতিকভাবে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মৌলভীবাজার জেলার মিশ্র চিরসবুজ পাহাড়ি বনাঞ্চলে মুলি বাঁশ প্রচুর জন্মায়। এ ছাড়া কুমিল্লা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলের শাল বনে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মানো মুলি বাঁশের বিস্তৃতি রয়েছে।

পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য ঃ মুলি একটি মাঝারি আকৃতির ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত আংশিক নমনীয় ধরনের বাঁশ। এটি লম্বায় ৩০-৩৬ ফুট ও মোটায় ২-৪ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। মুলি বাঁশের ভূমিস্থ মুথা সরু লম্বাটে জালের মতো বিস্তৃত এবং মুথা থেকে প্রায় ১-২ ফুট দূরে দূরে এক একটি বাঁশ উৎপন্ন হয়। ফলে ঘনভাবে ঝাড় সৃষ্টি করে না এবং বাঁশগুলো অত্যন্ত ফাঁকা ভাবে বিন্যস্ত থাকে। বাঁশের গোড়ার অংশ একটু মোটা এবং গিঁটগুলোর নিচে অস্পষ্ট সাদা বর্ণের বলয় থাকে। দুই গিঁটের মাঝের স্থান বেশ লম্বাটে, ১২-১৪ ইঞ্চি এবং কেন্দ্রভাগ বেশ ফাঁপা। বাঁশের গোড়ার গিঁটগুলোতে কঞ্চি জন্মায় না, তবে আগার দিকের গিঁটগুলোতে গুচ্ছাকারে নরম ধরনের অসংখ্য কঞ্চি জন্মায়। পাতা বল্লমাকৃতি এবং ঘনভাবে সজ্জিত। বাঁশ ঝাড়ে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মানো কোঁড়লগুলো সবুজ বর্ণের। সীথের উপরি পৃষ্ঠ রূপালি রোমশ দ্বারা আবৃত ও নিম্ন পৃষ্ঠ রোমশহীন মসৃণ এবং সীথগুলো খসে পড়ে না। মুলি বাঁশে ৩০-৪৫ বছর পর ফুল-ফল ধরে। বাঁশ ঝাড়ে ১ থেকে ৩ বছর বা কখনো ১০ বছর পর্যন্ত প্রচুর ফুল-ফল দিয়ে অবশেষে ঝাড়ের সকল বাঁশ মারা যায়। ফল দেখতে অনেকটা পেঁয়াজ বা নাশপাতির মতো, ফলের বোটার দিক স্ফীত ও মাংসল এবং শেষপ্রান্ত ক্রমশ: সরু। মুলির ফল অপরিপক্ক অবস্থায় সবুজ এবং পরিপক্ক অবস্থায় হলুদাভ বর্ণের হয়। মুলির মাংসল ফল ইঁদুরে খেয়ে থাকে।

ছবি-৯ (ক): ফলসহ মুলি বাঁশের ঝাড়

ছবি-৯ (খ): মুলি বাঁশের ফুল (বামে) এবং ফল (ডানে)

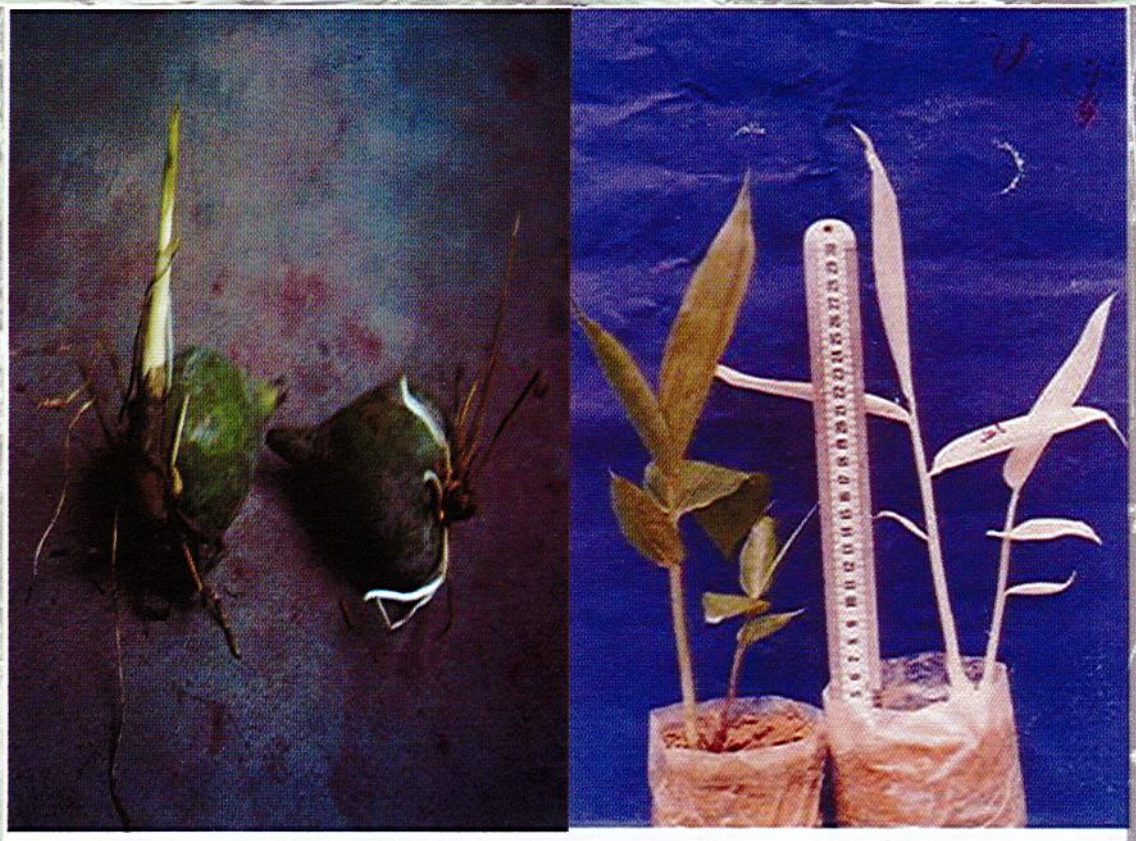

ছবি-৯(গ): মুলির অংকুরোদগম বীজ (বামে) এবং বীজ থেকে গজানো চারা (ডানে)

প্রজনন ও বংশ বিস্তার ঃ প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে প্রাকৃতিকভাবে বাঁশ ঝাড়ে কোঁড়ল জন্মায় এবং বাঁশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাঁশ ঝাড়ে জন্মানো কোঁড়লগুলো ৪-৬ মাসের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ সাইজের বাঁশে এবং পরবর্তীতে কঞ্চি ও পাতা জন্মায়। প্রতি বছর মুলির ঝাড়ে ৩০-৪০টি করে নতুন বাঁশ জন্মায় এবং বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে বিস্তৃতি ঘটায়। এ ছাড়া মুথা বা অফসেট ও বীজের সাহায্যে মুলি বাঁশের বংশ বিস্তার হয়।

চাষ পদ্ধতি ঃ বন এলাকা বা পতিত জমিতে ২৫ ফুট X২৫ ফুট দূরত্ব হিসেবে মুলির বীজজাত চারা, মুথা বা অফসেট লাগাতে হয়। মাঠ পর্যায়ে লাগানো চারার জীবিতের হার শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ। উপযুক্ত পরিবেশে ৪-৫ বছরের মধ্যে বীজজাত চারা থেকে গজানো বাঁশ ক্রমাগতভাবে আকৃতিতে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ সাইজের বাঁশে পরিণত হয়। ব্যক্তিগতভাবে শখ করে অনেকে বাড়ির আঙ্গিনাতে বীজ লাগিয়ে মুলি বাঁশের আবাদ করে থাকে।

বাঁশের ফলন ও সংগ্রহণ পদ্ধতি ঃ মুলি বাঁশে ৮-১০ বছর পর পরিপক্কতা আসে এবং ঝাড় থেকে পরিপক্ক বাঁশ সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশে মুলি বাঁশের ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ১২,০০০টি অথবা কাঁচা অবস্থায় ওজনে প্রায় ৮৪ টন বা শুষ্ক ওজনে প্রায় ৩৮ টন বাঁশ পাওয়া যায়।

ছবি-৯ (ঘ): মুলি বীজ ভক্ষণে ইঁদুর (উপরে) এবং সুস্বাদু কোঁড়ল ও আগার অংশ (নীচে)

গুরুত্ব ও ব্যবহার ঃ বাংলাদেশে অনেকে মুলি বাঁশ দিয়ে বসত ঘর তৈরি করে। মুলি বাঁশ বেশ হালকা, মধ্যম শক্ত ও সোজা বিধায় গৃহ নির্মাণের হালকা কাজে, দেয়ালকে নকশার কাজে, ঝুড়ি, মাদুর, দেয়াল পর্দা, মাথার টুপি, গৃহস্থালির তৈজসপত্র, হস্ত শিল্পজাত ও কুটির শিল্পের পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। মুলি বাঁশ দিয়ে সস্তা দামের আসবাবপত্র তৈরি করা হয়ে থাকে। কাপ্তাইর চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলি পেপার মিলে উন্নতমানের কাগজ তৈরিতে ও রেয়ন মিলে অধিক হারে মুলি ব্যবহৃত হয়। পাতা গবাদি পশুর উপাদেয় খাদ্য। মুলি বাঁশের কোঁড়ল সুস্বাদু বিধায় পাহাড়িরা প্রতিনিয়ত কোঁড়ল সবজি হিসেবে রান্না করে খায় এবং বাজারজাত করে থাকে। এছাড়া কোঁড়লগুলো পাতলা স্লাইচ করে কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে সংরক্ষণ করে রাখে। এগুলো অমৌসুমে সবজি হিসেবে রান্না করে খেয়ে থাকে। মুলির বীজ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

লতা বাঁশ

পরিচিতি ঃ লতা বাঁশ (*Melocalamus compactiflorus*) অঞ্চলভেদে লতানো বাঁশ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম), ধোরা, ধারা, দারাল বাঁশ (সিলেট) ইত্যাদি নামে পরিচিত। এটি লতানো প্রকৃতির স্থানীয় প্রজাতির বনজ বাঁশ। বর্তমানে বাংলাদেশে লতা প্রজাতির বাঁশের অস্তিত্ব বিপন্ন ও বিরল হয়ে পড়েছে। বুনন কাজে লতা বাঁশ ব্যবহার করা হয়।

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান ঃ আমাদের দেশে লতা বাঁশের বিস্তৃতি সীমাবদ্ধ অবস্থাতে রয়েছে। কক্সবাজারের টেকনাফ ও পানের ছড়া বনাঞ্চলের ছোট ছোট পাহাড়ের ঢালুতে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো সীমিত সংখ্যক লতা বাঁশের ঝাড় রয়েছে। অতীতে কক্সবাজারের বিভিন্ন বনাঞ্চলে এর ব্যাপক বিস্তৃতি ছিল। এ প্রজাতির বাঁশ চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউটের বাঁশ উদ্যানে এবং ঢাকার মিরপুর জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে সংরক্ষিত আছে।

ছবি-১০ (ক) : লতা বাঁশের ঝাড়

পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য ঃ লতা বাঁশ বেশ লম্বাটে ও লতানো ধরনের আরোহী স্বভাবের এবং বনের অন্যান্য বড় গাছের সাথে আরোহণ করে বেড়ে ওঠে। এটি পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট এবং ঝাড়ের বাঁশগুলো মধ্যমভাবে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে একস্থান থেকে উত্থিত হয়ে ঘন লতানো ঝোপের সৃষ্টি করে। এটি লম্বায় ৩০-৯০ ফুট ও মোটায় ০.৫-১.০ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। বাঁশের গিঁটগুলো সীথ দ্বারা আবৃত এবং এর নিচে সাদা বর্ণের মখমলের মতো কুড়োযুক্ত বলয় রয়েছে। বাঁশের গোড়ার অংশ সবচেয়ে মোটা এবং কঞ্চির মতো সরু। দুই গিঁটের মাঝের স্থান লম্বায় ১২-২৪ ইঞ্চি এবং অভ্যন্তরভাগের ফাঁপা অংশ অত্যন্ত সরু। বাঁশের গোড়া এবং আগার দিকের কয়েকটি গিঁটে কোনো কঞ্চি জন্মায় না, তবে মাঝের গিঁটগুলোতে ২-৩টি করে কঞ্চি জন্মায়। পাতা বেশ বড় ও বল্লমাকৃতি এবং আগা কিছুটা মোচড়ানো। বাঁশ ঝাড়ে জন্মানো কোঁড়লগুলো বর্ণে হলদে-সবুজ। কোঁড়লের সীথগুলোর উপরি পৃষ্ঠ সাদাটে কুড়ো ও কালচে-বাদামি বর্ণের রোমশ কুড়ো বা শুধু কুড়ো দ্বারা আবৃত, নিম্ন পৃষ্ঠ রোমশহীন মসৃণ এবং সীথগুলো খসে পড়ে না। লতা বাঁশে ফুল ও ফল আসে বহু বছর পরে। কক্সবাজার বনাঞ্চলে ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে লতা বাঁশে ফুল-ফল আসার তথ্য পাওয়া যায়। ফল বা বীজ আকারে বড় ও উপবৃত্তাকার, দেখতে অনেকটা কাজু বাদাম বা আপেলের মতো, সবুজ থেকে বাদামি বর্ণের, গোড়ার দিকে স্থায়ী গ্লুম রয়েছে। বহিরাবরণ পুরু মাংসল ধরনের এবং শাঁসযুক্ত।

ছবি-১০ (খ) : লতা বাঁশের ফুল-ফল (বামে) এবং অংকুরিত বীজ (ডানে)

প্রজনন ও বংশ বিস্তার ঃ প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে প্রাকৃতিকভাবে বাঁশ ঝাড়ের চারিদিকে কোঁড়ল জন্মায় এবং বাঁশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নতুন গজানো কোঁড়ল ২-৩ মাসের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্নাঙ্গ বাঁশে পরিণত হয়। এ ছাড়া মুথা, কান্ড ছেদন ও বীজের সাহায্যে লতা বাঁশের বংশ বিস্তার হয়।

চাষ পদ্ধতি ঃ আমাদের দেশে সাধারণত বীজের চারা, মুথা ও কান্ড ছেদন পদ্ধতিতে লতা বাঁশের চাষাবাদ করা হয়। লতা বাঁশ আধা-পাতাঝরা বৃক্ষ বিশিষ্ট বৃষ্টিবহুল সংরক্ষিত বনাঞ্চলের আর্দ্রতাযুক্ত ও আধা ছায়াময় স্থানের নালা বা ছড়ার ধারে লাগিয়ে বাঁশের বাগান সৃজন করা যায়। বর্ষা মৌসুমে চারা থেকে চারা ১০ ফুট এবং সারি থেকে সারি ১০ ফুট দূরত্বে লতা বাঁশের বীজজাত চারা, ১-২ বছর বয়সের মুথা এবং ২-৩টি গিটযুক্ত কান্ড ছেদন সরাসরি মাটিতে লাগানো হলে ৬-৯ মাসের মধ্যে নতুন বাঁশ গজাবে।

বাঁশের ফলন ও সংগ্রহণ পদ্ধতি ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে মুথা লাগানোর ৩-৪ বছর পর বাঁশের ঝাড় থেকে বয়স্ক বাঁশ সংগ্রহ করা যায়।

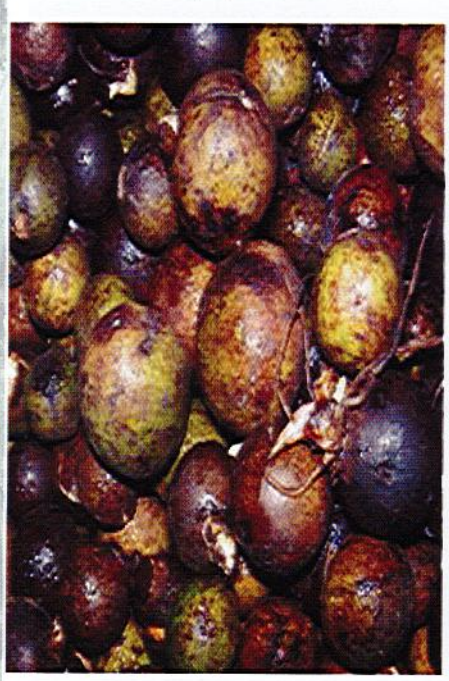

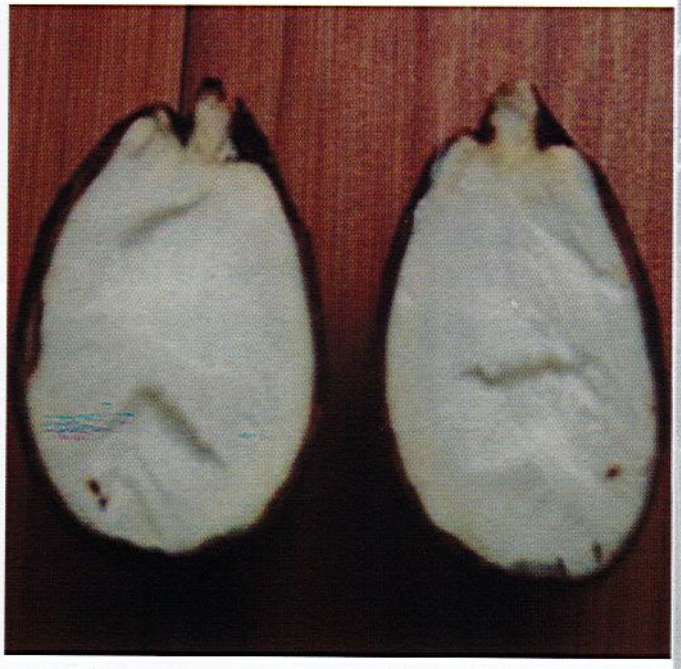

ছবি-১০ (গ) : লতা বাঁশের অংকুরিত বীজ এবং মাংসল ধরনের শাঁসযুক্ত বীজ

গুরুত্ব ও ব্যবহার ঃ বুনন কাজে লতা বাঁশ ব্যবহার করা হয়। বাঁশের বহিস্থ সবুজ তন্তুময় নরম আবরণ মোড়ানো যায় বিধায় এ দিয়ে জুতা-স্যান্ডেল ও ঝুড়ি তৈরি করা হয়। এছাড়া সরু বাঁশ রশি-দড়ি হিসেবে সাঁকো, সেতু ও পুল নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়। লতা বাঁশের বীজের মাংসল শাঁস খাওয়া যায়।

বাঁশের চারা ও কলম উৎপাদন পদ্ধতি

বাঁশের বংশ বিস্তারের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে চারা ও কলম উৎপাদন করা হয়:

১। বীজ থেকে চারা উৎপাদন

২। অঙ্গজ পদ্ধতিতে কঞ্চি কলম ও গুঁটি কলম উৎপাদন

৩। টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন

৪। বীজজাত চারা আলাদাকরণ ও সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ

বীজ থেকে চারা উৎপাদন ঃ

বাঁশের বীজ দিয়ে সহজে, কম পরিশ্রমে ও অল্প খরচে অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদন করা যায়।

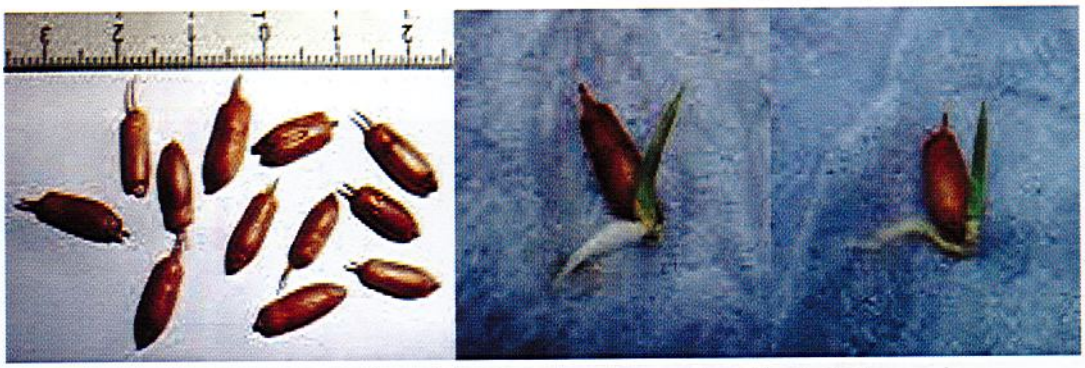

ছবি-১১ (ক): ওরা বাঁশের বীজ (বামে) এবং অংকুরিত বীজ (ডানে)

ছবি-১১ (খ): পলিব্যাগে উত্তোলিত ওরা বাঁশের চারা

ছবি-১১ (গ): মুলি বাঁশের বীজ (বামে) এবং অংকুরিত বীজ (ডানে)

ছবি-১১ (ঘ): নার্সারিতে উত্তোলিত মুলি বাঁশের চারা

আমাদের দেশে কিছু কিছু বাঁশে ফুল-ফল ধরতে দেখা যায়। আবার কোনো কোনো প্রজাতির বাঁশে ফুল আসলেও ফল ধরে না। ওরা, মিতিঙ্গা বাঁশের বীজ অনেকটা গমের মতো। তবে মুলি বাঁশের ফল বা বীজ আকৃতিতে বড় এবং দেখতে অনেকটা পেঁয়াজ বা নাশপাতির মতো। নার্সারিতে বাঁশের বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা যায়। উৎপাদিত চারা মাঠে লাগানো হলে বাঁশ ঝাড় সৃষ্টিতে প্রায় ৬-৭

বছর লেগে যায়। বাঁশের বীজ থেকে চারা উৎপাদনে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা আবশ্যক।

১। বাঁশ ঝাড়ে ফুল দেখা গেলে লক্ষ্য রাখতে হবে, ফোটা ফুল হতে বীজ গঠিত হচ্ছে কিনা। বাইজ্যা, বোরাক বাঁশে ফুল থেকে বীজ হয় না।

২। বাঁশের বীজ পরিপক্ক হলে ঝরে পড়ে। বিভিন্নধরনের পাখি, বন মোরগ, ইঁদুর ও কাঠ বিড়ালি বাঁশের বীজ খেয়ে থাকে।

৩। বাঁশের বীজ পরিপক্ক হলে সংগ্রহ করতে হবে এবং শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যাবে।

৪। বাঁশের বীজের আয়ুস্কাল সংক্ষিপ্ত বিধায় সংগৃহীত পরিপক্ক বীজ অল্প সময়ের মধ্যে বপন করতে হবে। বাঁশের বীজ সরাসরি বীজ তলাতে বপন করে অথবা পলিব্যাগে লাগিয়ে চারা উত্তোলন করা যায়।

৫। বাঁশের পরিপক্ক বীজ বাঁশ ঝাড় হতে ঝরে যায়। তাই বীজ পরিপক্ক হলে সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। অন্যথায় মাটিতে পড়া বীজ বন মোরগ ও ইঁদুর খেয়ে ফেলতে পারে।

৬। বৃষ্টির পরে ঝাড়ের তলাতে বাঁশের বীজ হতে প্রচুর চারা গজায় এবং গজানো চারা উঠিয়ে এনে নার্সারিতে পলিব্যাগে লাগিয়ে দিলেও চারা যথারীতি বেড়ে উঠবে।

৭। ব্যাগের চারা রোপণ উপযুক্ত হলে এবং মৌসুমি বৃষ্টি শুরু হলে অর্থাৎ মে মাসের মাঝামাঝি হতে জুন মাসে বাঁশের চারা জমিতে লাগাতে হবে।

৮। মুলি বাঁশের পরিপক্ক বীজ ঝড়ে পরার পর অথবা বৃষ্টি বা আর্দ্র আবহাওয়া থাকলে বাঁশ ঝাড়েই অংকুরিত হয়ে থাকে। তাই অংকুরিত বীজ পাওয়া গেলে আর্দ্র বা ভিজা স্থানে সংরক্ষণ করে সরাসরি প্রস্তুতকৃত জমিতে লাগাতে হবে।

নিম্মোক্ত ভাবে বাঁশের বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা যায়।

(ক) বীজতলা বা সীড বেডে বাঁশের চারা উৎপাদন কৌশল ঃ

বীজতলার অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদন করা যায় এবং বীজের অপচয় রোধ করা সম্ভব। ওরা, মিতিঙ্গা বা অন্যান্য জাতের বাঁশের চারা উৎপাদনে সংগৃহীত পরিপক্ক বীজ ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে বীজতলায় বপন করতে হবে। তবে মুলি বাঁশের ক্ষেত্রে বীজতলার পরিবর্তে সরাসরি পলিব্যাগে গোটা ফল বা বীজ লাগিয়ে চারা উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

নিম্নে বীজতলায় বাঁশের চারা উৎপাদনের কলা-কৌশল প্রদান করা হলো ঃ

১। বীজ বপনের আগে বীজতলার উপরের স্তর ভালোভাবে কুপিয়ে ঝুরঝুরে ও ফাঁপা করে ফেলতে হবে। এর ফলে মাটির ভিতরে সহজেই বাতাস চলাচল করতে পারবে এবং চারাগুলোর শিকড় সহজেই মাটিতে প্রবেশ করে খাদ্য ও রস গ্রহণ করতে পারবে।

২। বীজতলায় বীজ বপনকালে চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে কমপক্ষে ২ ইঞ্চি এবং গভীরতা হবে ১ ইঞ্চি।

৩। বীজ বপনের পর বীজতলা বাঁশের চাটাই অথবা অন্য কিছু দিয়ে তৈরি ঝাপ দিয়ে ২/৩ দিন ঢেকে রাখতে হবে। বীজ বপনের পর বীজতলাতে প্রতিদিন সকাল-বিকাল পানি দিতে হবে। বীজ গজানো

শুরু হলে বীজতলায় ঢেকে রাখা বাঁশের চাটাই তুলে ফেলতে হবে।

৪। বীজতলায় গজানো চারাগুলোকে অতিরিক্ত রৌদ্র ও বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য মাচান করে বাঁশের চাটাই অথবা অন্য কিছু দিয়ে তৈরী ঝাপ ব্যবহার করতে হবে। চাটাই অথবা ঝাপ এমনভাবে খুঁটির উপরে দিতে হবে যেন বীজতলা থেকে ১.৫ ফুট উপরে থাকে। সকাল-বিকেল চাটাই অথবা ঝাপ সরিয়ে চারাগুলোতে রৌদ্র ও বাতাস লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। চারাগুলো আকারে যতই বাড়বে ততই তাদের রোদের তীব্রতা সহ্য করার শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৫। বীজতলার মাটিতে প্রয়োজনীয় রসের অভাব হলে সেচ দিতে হবে। বপনকৃত বীজ থেকে ১০-৪০ দিনের মধ্যে চারা গজানো সম্পন্ন হবে।

৬। বীজতলার মাটি যদি ভিজা বা স্যাঁতস্যাঁতে থাকে তবে মাটিতে বসবাসকারী জীবাণুগুলো সক্রিয় হয়ে পড়ে। এতে বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে। এসব রোগের ভিতর গোড়া পচা রোগ উল্লেখযোগ্য। এ রোগের কারণে অনেক সময় চারা উৎপাদন ব্যাহত হয়। এ রোগের আক্রমণ দেখা দিলে বীজতলা শুকনা রাখা, কুপ্রাভিট অথবা ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে সেচের পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যাবে।

৭। বীজতলার চারাতে ৩-৪টি পাতা গজালে এবং ২-৩ ইঞ্চি লম্বা হলে বীজতলা থেকে চারা তুলে পলিথিন ব্যাগে স্থানান্তর ও রোপণ করতে হবে। চারা তোলার সময় চারার গোড়ার শিকড় যেন ছিড়ে না যায় সে জন্য বীজতলা ভালো করে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে।

৮। পলিথিন ব্যাগে রোপিত বাঁশের চারাগুলোর শক্তকরণে এবং জীবিতের হার বাড়াতে ছায়াযুক্ত স্থানে প্রায় ২ সপ্তাহ রেখে প্রতিনিয়ত পানি দিয়ে এবং আগাছা তুলে চারার যত্ন করতে হবে। এছাড়া পলিথিন ব্যাগে রোপিত বাঁশের চারাগুলোকে নার্সারি বেডে সারিবদ্ধভাবে রেখে উপরিভাগে মাচান তৈরি করে বাঁশের চাটাই বা ছন বা কালো পলিথিন সীট দিয়ে ছায়া প্রদান করতে হবে।

৯। পরবর্তীতে বাঁশের চারাগুলোর বৃদ্ধিকরণে ছায়া চালা সরিয়ে রৌদ্র ও বাতাস লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। নিয়মিত চারার পরিচর্যা করে মাঠে লাগানোর উপযোগী করে তুলতে হবে।

(খ) পলিথিন ব্যাগে বাঁশের চারা উৎপাদন ঃ

পলিথিন ব্যাগে সরাসরি বাঁশের চারা উৎপাদন করা যায়। বিভিন্ন সাইজের পলিথিন ব্যাগে বাঁশের চারা উৎপাদনে নার্সারি বেড ব্যবহার করা হয়। বাঁশের বীজজাত চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগের সাইজ নির্ভর করে নার্সারিতে বাঁশের চারা রাখার স্থায়িত্বের উপর। নার্সারিতে সাধারণত ১ বছরের জন্য ৯ X ১২ ইঞ্চি সাইজের পলিথিন ব্যাগে বাঁশের চারা উৎপাদন করা হয়।

অঙ্গজ পদ্ধতিতে কঞ্চি কলম উৎপাদন ঃ

যে সকল বাঁশের কান্ডের দেয়াল/প্রাচীর পুরু সেগুলোর কঞ্চিগুলো কলম জাত চারা উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত। বাইজ্যা, বোরাক, ঘটি, সোনালি, বুদুম প্রজাতির বাঁশ থেকে সহজে কঞ্চি কলম উৎপাদন করা যায়।

ছবি-১২ (ক): করাত দিয়ে বাঁশের প্রাক-মূল কঞ্চি সংগ্রহ

ছবি-১২ (খ): বালতির পানিতে সংগ্রহীত কঞ্চি সংরক্ষণ এবং সাইজ করা কঞ্চিসমূহ

ছবি-১২ (গ): বালির বেডে কঞ্চি স্থাপন (বামে) এবং শিকড় গজানো কঞ্চি কলম (ডানে)

ছবি-১২ (ঘ): নার্সারিতে পরিচর্যারত কঞ্চি কলম

বাঁশের কঞ্চি কলম উৎপাদনের কলা-কৌশল এবং পদক্ষেপসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

১। বালির প্রোপাগেশন বেড সাধারণত চওড়ায় ৪ ফুট এবং লম্বায় ১০ থেকে ৪০ ফুট পর্যন্ত করা যেতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে বেডের সাইজ কম-বেশি করা যেতে পারে। নার্সারির সমতল জায়গার মাটিতে ৬-১০ ইঞ্চি গভীর গর্ত করে সেটি বালি দিয়ে ভর্তি করে প্রোপাগেশন বেড তৈরি করা যায়। এছাড়া মাটির উপরিভাগে প্রোপাগেশন বেড করার ক্ষেত্রে ইট বা বাঁশের দরজা দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে মাটির তলদেশে পলিথিন সীট বিছাতে হবে।

২। পানি প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। কঞ্চি কলমের জন্য পছন্দনীয় ও সুবিধাজনক বাঁশের প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।

৪। নির্বাচিত বাঁশ ঝাড় অবশ্যই রোগ মুক্ত হতে হবে।

৫। বাঁশ ঝাড় থেকে ১-২ বছর বয়সের বাঁশ হতে কঞ্চি সংগ্রহ করতে হবে। অনেক সময় বাঁশ ঝাড়ে আগা ভাঙ্গা বাঁশের গিঁটগুলোতে প্রাকৃতিকভাবে প্রাক-মূল জন্মাতে দেখা যায়। এ সকল প্রাক-মূল কঞ্চি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং ঝাড়ের অন্যান্য বাঁশের কঞ্চি নির্বাচন করে গিঁটের সাথে সংযুক্ত কঞ্চির গোড়ার মোটা অংশ হাত করাত দিয়ে কেটে পৃথক করতে হবে।

৬। বাঁশের গিঁটগুলোতে প্রাকৃতিকভাবে প্রাক-মূল সৃষ্টি করতে বাঁশ ঝাড়ে বিদ্যমান ১ বছর বয়সের বাঁশগুলোর আগা কেটে দিলে পরবর্তীতে গিঁটগুলোতে প্রাক মূল জন্মাবে। এসকল প্রাক-মূল বিশিষ্ট কঞ্চি কেটে প্রোপাগেশন বেডে লাগানো হলে শতভাগ কঞ্চি কলম পাওয়া যায়।

৭। কঞ্চি সংগ্রহের পরে কঞ্চিতে ৩-৫ গিঁটসহ প্রায় দেড় ফুট লম্বা রেখে আগার অংশ কেটে ফেলতে হবে।

৮। সংগৃহীত কঞ্চিগুলো পানিতে ভিজিয়ে এবং চটের বস্তা বা পলিথিন সীট দিয়ে জড়িয়ে আর্দ্র অবস্থায় নার্সারিতে আনতে হবে।

৯। কঞ্চিগুলো লাগানোর পূর্বে পানি দিয়ে প্রোপাগেশন বেড ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

১০। প্রোপাগেশন বেডের বালিতে এক/দেড় ইঞ্চি গভীরে এবং ২-৩ ইঞ্চি পর পর সারিবদ্ধভাবে কঞ্চিগুলো লাগাতে হবে।

১১। কঞ্চিগুলো লাগানোর পর ঝরনা দিয়ে প্রতিদিন ৩-৪ বার করে পানি দিয়ে কঞ্চিগুলো ভিজিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখাতে হবে কোনো ভাবেই যেন কঞ্চিগুলো শুকিয়ে না যায়। প্রয়োজনে বাঁশের চাটাই বা অন্য কিছু দিয়ে প্রোপাগেশন বেডের উপর আংশিক ছায়া দিতে হবে। এছাড়া লাগানো কঞ্চিগুলো থেকে যাতে পানি বের হয়ে শুকিয়ে না যায় সেজন্য কঞ্চির আগার কাটা অংশে আঠালো কাদা মাটি বা কাঁচা গোবর লাগিয়ে দিতে হবে।

১২। প্রোপাগেশন বেডে যাতে পানি জমা হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। ২০ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বেডে লাগানো কঞ্চির গিঁট হতে নতুন শাখা ও পাতা এবং গোড়াতে প্রচুর গুচ্ছমূল/শিকড় গজাবে।

১৪। গুচ্ছমূলসহ বাঁশের কঞ্চি সাবধানে তুলে গোবর মিশ্রিত মাটি ভর্তি পলিব্যাগে লাগাতে হবে।

১৫। পলিব্যাগে রোপিত বাঁশের কঞ্চি কলমগুলো ১-২ সপ্তাহ পর্যন্ত আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। তারপর নার্সারি বেডে স্থানান্তরিত করে আলো-বাতাসের ব্যবস্থাসহ পরিচর্যা পূর্বক জমিতে লাগানোর উপযোগী করে তুলতে হবে।

১৬। পরবর্তী বর্ষা মৌসুমে কঞ্চি কলমগুলো নির্বাচিত জমিতে লাগাতে হবে।

পলিব্যাগ চারার সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ ঃ

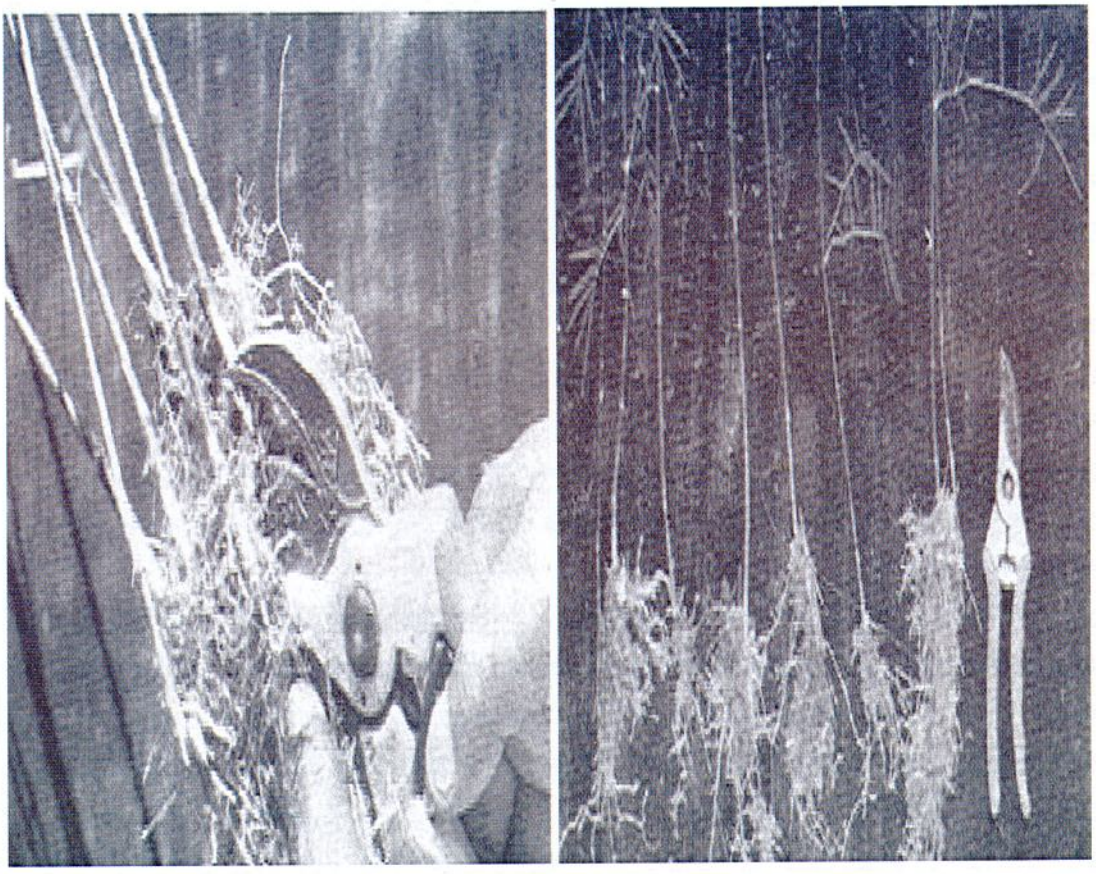

ছবি-১৩: পলিব্যাগের চারা সিকেচার কেঁচি দিয়ে কেটে পৃথক করে চারার সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া

১। পলিব্যাগে উত্তোলিত ৬ মাস বয়সের চারাগুলোর গোড়াতে নতুন মুথা বা রাইজোম সৃষ্টির মাধ্যমে একাধিক চারার জন্ম দেয়।

২। বাঁশের চারার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য পলিব্যাগ ছিড়ে চারাটিকে বের করে চারার শিকড়গুলো পনিতে ধুয়ে সিকেচার কেঁচি দিয়ে রাইজোমযুক্ত প্রতিটি চারাকে কেটে পৃথক করে নিতে হবে।

৩। পৃথক করা চারাগুলোকে সাথে সাথে পলিব্যাগে স্থানান্তর পূর্বক রোপণ করে ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে নিয়মিত পানি দিয়ে নুন্যতম এক মাস পরিচর্যা করতে হবে।

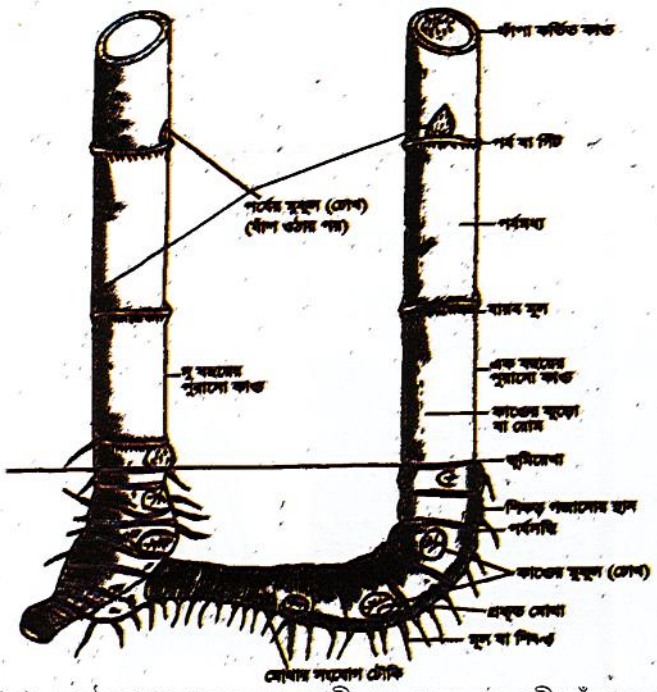

ছবি-১৪ (ক): মাঠে লাগানোর জন্য সংগৃহীত ১-২ বছর বয়সী বাঁশের মুথা

ছবি-১৪ (খ): কালো পলিথিন ব্যাগে মাঠে লাগানোর উপযোগী বাঁশের মুথা

আমাদের দেশে প্রচলিত সনাতন পদ্ধতিতে মুথা দিয়ে সীমিত আকারে বাঁশ চাষ করা হতো। বাণিজ্যিকভাবে বাঁশ চাষ করতে হলে প্রচুর সংখ্যক বাঁশের মুথার প্রয়োজন হয় যা সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার এবং অধিক ব্যয়বহুল। এ ক্ষেত্রে বাঁশের কঞ্চি কলম এবং বীজ থেকে উৎপাদিত চারা দিয়ে অধিক হারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাঁশ চাষ করা যায়। বাঁশের মুথা, কঞ্চি কলম বা চারা কিভাবে লাগাবেন এবং কি কি পরিচর্যা করতে হবে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

মুথা, কঞ্চি কলম বা চারা লাগানোর নিয়মাবলী ঃ

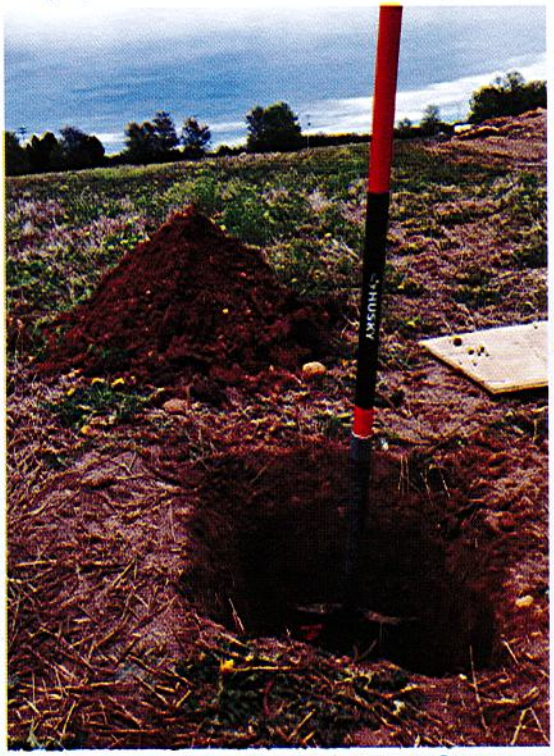

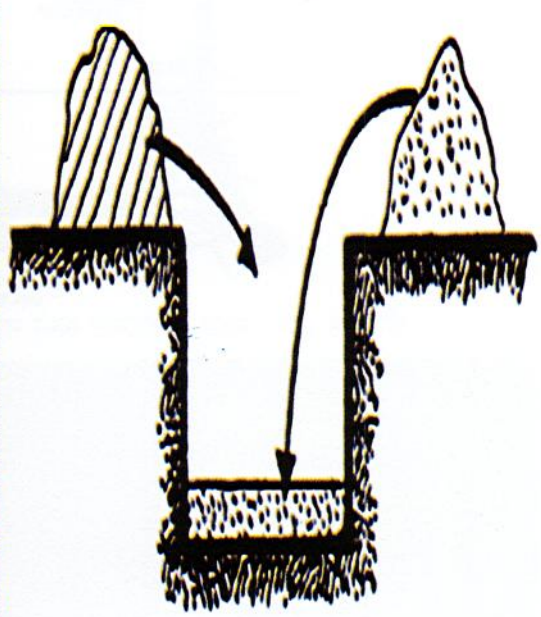

ছবি-১৫ (ক): মুথা, কঞ্চি কলম বা চারা লাগানোর জন্য গর্ত খনন

১। বাড়ির আশপাশে বা পতিত জমিতে মুথা, কঞ্চি কলম বা চারা লাগানো যেতে পারে।

২। মে-জুন মাস হচ্ছে মুথা, কঞ্চি কলম বা চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়।

৩। মুথা, কঞ্চি কলম বা চারা লাগানোর জন্য প্রথমে গর্ত করতে হবে। গর্তের সাইজ হবে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতায় এক হাত করে।

৪। একটি গর্ত থেকে অন্য গর্তটির দূরত্ব হবে ১০-১২ ফুট।

৫। খননকৃত গর্তের উপরিভাগের অর্ধেক মাটি এক পাশে এবং তলদেশের বাকী অর্ধেক মাটি অন্য পাশে রেখে দিতে হবে।

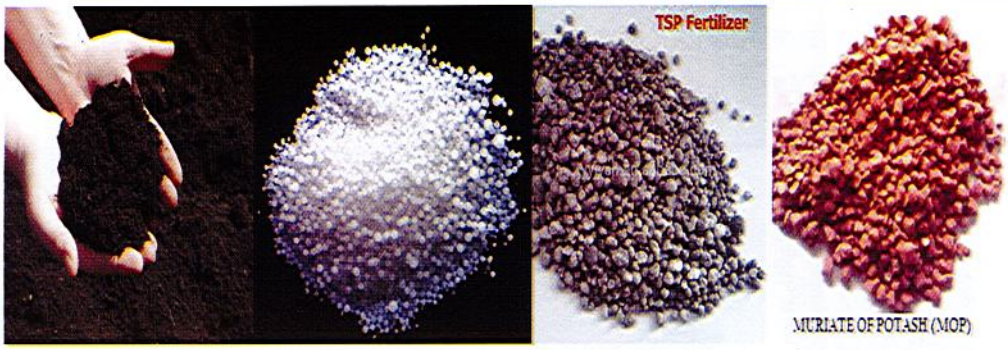

গোবর ইউরিয়া টিএসপি এমপি

৬। খননকৃত গর্তের উপরিভাগের অর্ধেক মাটির সাথে ৫ কেজি গোবর, ২০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০ গ্রাম টিএসপি ও ১৫ গ্রাম এমপি সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ১৫-২০ দিন রাখতে হবে।

ছবি-১৫ (খ): গর্তের মাঝে মুথা, কঞ্চি কলম বা চারা রোপণ প্রক্রিয়া

৭। ১৫-২০ দিন পরে ভরাটকৃত গর্তের মাঝখানের কিছুটা মাটি তুলে তৎস্থলে বাঁশের মুথা, কঞ্চি কলম বা চারা রোপণ করতে হবে।

৮। গর্তের উপরিভাগে রেখে দেওয়া তলদেশের অবশিষ্ট মাটি দিয়ে রোপিত মুথা, কঞ্চি কলম বা চারার গোড়ার চারদিকে এমনভাবে চেপে দিতে হবে যাতে কেন্দ্রের দিকে সামান্য উঁচু এবং চারপার্শ্বে ঢালু হয়।

রোপিত মুথা, কঞ্চি কলম বা চারার পরিচর্যা ঃ

১। রোপিত মুথা, কঞ্চি কলম বা চারা যাতেঝড়ো বাতাসে হেলে না যায় সেজন্য গোড়াতে খুঁটি পুতে সুতলি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

২। বাঁশের বেড়া, খাঁচা বা নাইলনের জাল দিয়ে রোপিত মুথা, কঞ্চি কলম বা চারাকে জীব-জন্তুর হাত থেকে বাচাঁতে হবে।

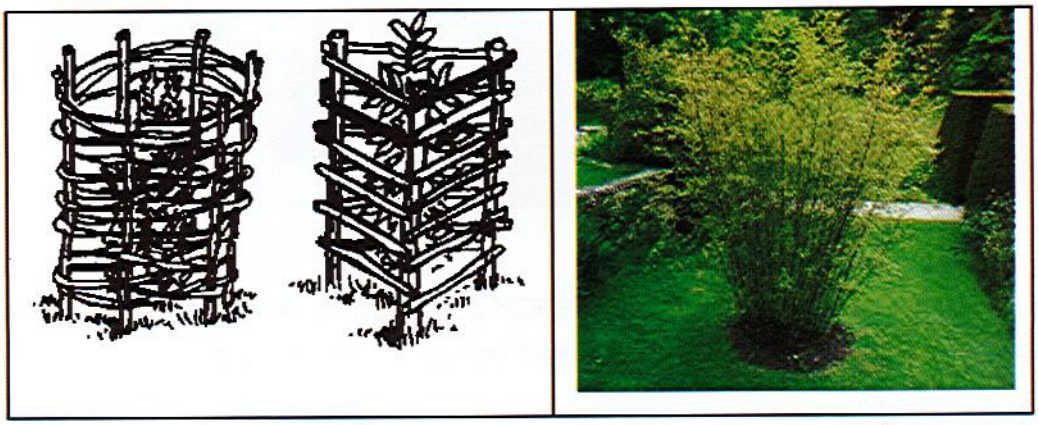

ছবি-১৬: রোপিত বাঁশের চারাতে খাঁচা প্রদান (বামে) এবং চারার গোড়ার আগাছা পরিস্কার (ডানে)

৩। নিয়মিতভাবে রোপিত মুথা, কঞ্চি কলম বা চারার গোড়াতে জন্মানো আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

৪। মুথা, কঞ্চি কলম বা চারা রোপণের পর বৃষ্টি না হলে এবং খরার সময় নিয়মিত পানি দিতে হবে।

বাঁশ ঝাড়ের পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা

(ক) বাঁশ ঝাড় পরিস্কারকরণ ঃ

বাঁশ ঝাড়ের গোড়াতে ঝরে পড়া পাতা, মরা-পচা বা রোগাক্রান্ত বাঁশ, কঞ্চি, কোঁড়ল ইত্যাদি নিয়মিতভাবে অপসারণ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ছবি-১৭: বাঁশ ঝাড়ে নতুন মাটি প্রদান

(খ) নতুন মাটি প্রয়োগ ঃ

প্রতি বছর চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাঁশ ঝাড়ে নতুন কোঁড়ল জন্মানোর আগে ঝাড়ের গোড়াতে কৃষি জমির উপরিভাগের বা পুকুরের তলদেশের উর্বর মাটি দিতে হবে।

(গ) সার প্রয়োগ ও পানি সেচ ঃ

প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বাঁশ ঝাড়ে রাসায়নিক সার প্রয়োগ ও পানি সেচ দিতে হবে। একটি মাঝারি আকারের বাঁশ ঝাড়ের গোড়া থেকে ২-৩ হাত দূরের চারদিকের মাটিতে ১৮ ইঞ্চি চওড়া

ও ২৪ ইঞ্চি গভীর নালা কেটে প্রতি বছর ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, সমপরিমাণ ফসফেট ও ৫০ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগের পর নালাটি মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। সার প্রয়োগের পর বৃষ্টি না হলে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

বাঁশের রোগ-বালাই ও দমন ব্যবস্থা ঃ

ছবি-১৮: আগামরা রোগে আক্রান্ত কচি বাঁশ

বাঁশের আগামরা রোগ সাধরণত বোরাক বাঁশ, বাইজ্যা বাঁশ, মাকলা বাঁশ এবং তল্লা বাঁশ ঝাড়ে দেখা যায়।

বাঁশের নতুন কোঁড়ল বা কম বয়সী বাড়ন্ত বাঁশগুলো আগা মরা রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। কোঁড়ল আক্রান্ত হলে বাদামি-ধূসর রঙের হয়ে খোলস ঝড়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়।

কম বয়সী বা বয়স্ক বাঁশে এ রোগ দেখা দিলে আগা পচে মাথা ভেঙ্গে পড়ে।

রোগ নিয়ন্ত্রণে রোগাক্রান্ত বাঁশ বা কোঁড়ল কেটে পুড়িয়ে ফেলা উচিৎ বা মাটির নিচে চাঁপা দিতে হবে। রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে ২০ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে ঝাড়ের গোড়ার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। এছাড়া নতুন কোঁড়লগুলো ৩-৪ হাত লম্বা হওয়ার পূর্বে ডায়থেন এম-৪৫ স্প্রে করতে হবে।

ছবি-১৯: আগামরা রোগে আক্রান্ত বয়স্ক বাঁশ (বামে) এবং রোগ নিয়ন্ত্রণে ডায়থন এম-৪৫ ঔষধ স্প্রে (ডানে)

বাঁশ ঝাড় থেকে পরিপক্ক বাঁশ আহরণ ও ঝাড় পাতলাকরণ ঃ

কচি বাঁশ

পাকা বাঁশ

অতি পাকা বাঁশ

ছবি-২০: বাঁশ ঝাড় থেকে পরিপক্ক বাঁশ আহরণ
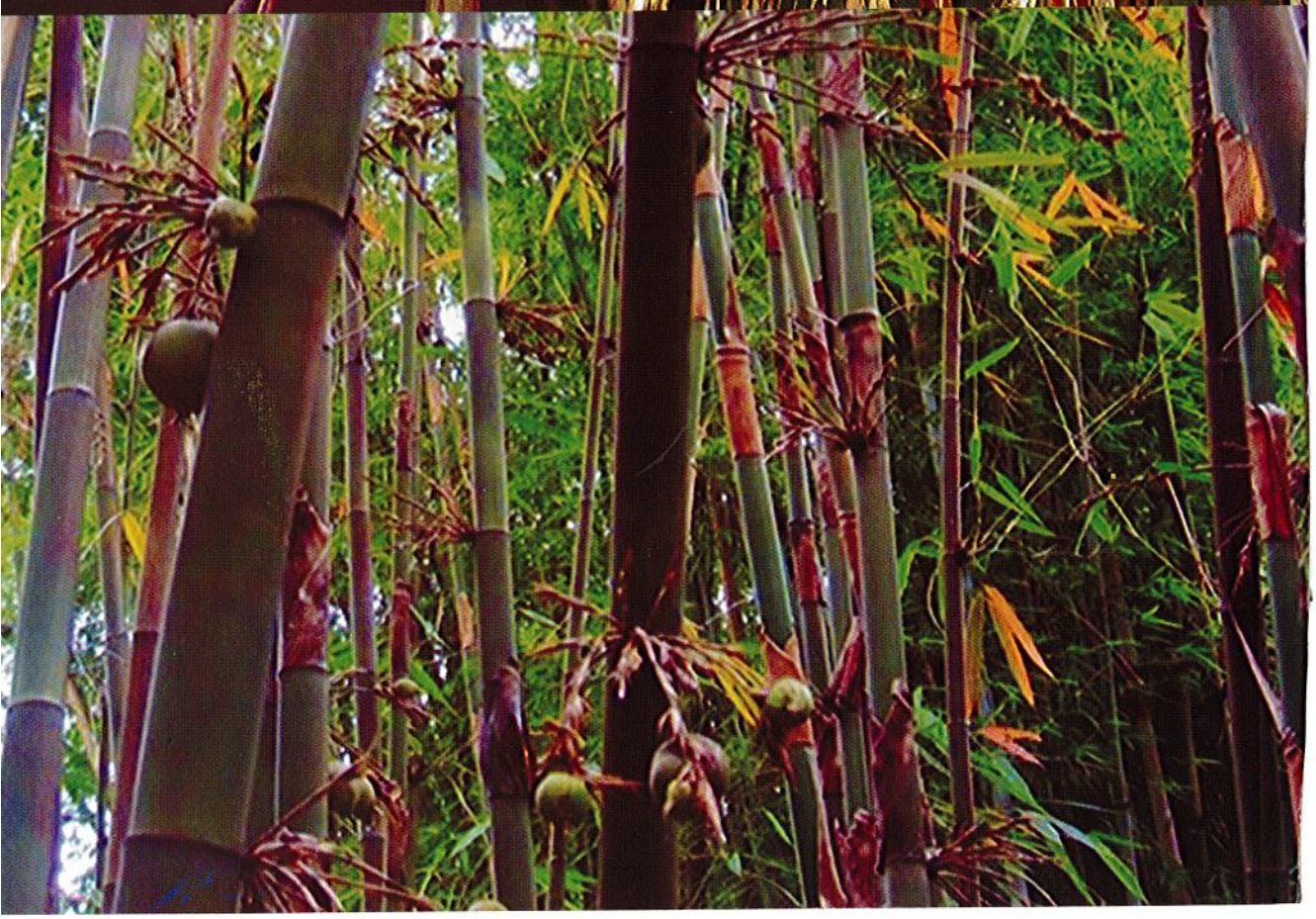
সাধারণত রোপিত মুথা ২-৩ বছরে, কঞ্চি কলম ৪-৫ বছরে এবং চারা ৫-৬ বছরের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ঝাড়ে পরিণত হয়ে থাকে। নতুন বাঁশ জন্মানোর মৌসুম (জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ মাস) কখনও বাঁশ কাটা উচিত নয়। কার্তিক থেকে চৈত্র মাসে পরিপক্ক বাঁশ কাটার উপযুক্ত সময়। যে বছর বাঁশ ঝাড়ে ফুল ও বীজ হয় সে বছর ঝাড়ের বাঁশ কাটা উচিত নয়। নতুন বাঁশ উৎপাদন ও বাঁশের বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর বাঁশ ঝাড় থেকে পরিপক্ক বাঁশ আহরণ করতে হবে। বাঁশ ঝাড় সৃষ্টির পর ৩-৪ বছর পর থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি বছর পরিপক্ক বাঁশ আহরণ করা যাবে। মনে রাখতে হবে, আহরণের সময় পরিপক্ক বাঁশ যা সাধারণত ঝাড়ের মধ্যভাগে থাকে সেগুলো আগে কাটতে হবে। পরিপক্ক বাঁশের গোড়া থেকে মাটির কাছাকাছি গিঁটের ঠিক উপরে তেছরা করে কেটে বাঁশটিকে সাবধানে বের করতে হবে। ঝাড়ের বাঁশগুলোতে কঞ্চি বেশি থাকলে কেটে অপসারণ করতে হবে। বাশঁ কাটার ক্ষেত্রে দা এর পরির্বতে হাত করাত ব্যবহার করতে হবে।